প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৫৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৬৫
তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৬৭
চতুর্থ সংস্করণ : আগষ্ট ১৯৭১

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
শহীদ কবীর
বর্ণলিপি :
আশিস চৌধুরী
ছেপেছেন :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

সাহিত্যতত্ত্বের নতুন
উত্তরাধিকারের জন্য

এই লেখকের

ক্ষুধা ও আশা, নাগরিক, পাতাল দরোজা. কর্ণফুলী, শীতের শেষরাত বসন্তের প্রথমদিন, তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, উজান তরঙ্গে, অন্ধকার সিঁড়ি, মৃগনাভি, ধানকন্যা, জেগে আছি, যখন সৈকত, মানচিত্র, ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ, সূর্যজ্বালার সোপান, ইহুদির মেয়ে, মায়াবী প্রহর, মরক্কোর জাদুকর, সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু, নিঃশব্দ যাত্রা, নরকে লাল গোলাপ, সংবাদ শেষাংশ, লেলিহান পাণ্ডুলিপি, নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ, ফেরারী ডায়েরী।

শিল্পীর সাধনা

শিল্পীর সাধনা

ফলিতবিজ্ঞানে কোনো বস্তুর গুণাগুণ গণিতের মাধ্যমে প্রকাশ্য। কিন্তু পরস্পরবিরোধী দু'টি বস্তুর মধ্যে চৈতন্যের উৎপত্তি নির্দেশ করা গেলেও, দর্শন অথবা নন্দনতত্ত্বের সূত্রনির্মাণে অঙ্কের হিসেব অচল। অবশ্য এক্ষেত্রেও সাধারণীকরণ স্বীকৃত, কিন্তু এক্ষেত্রে যে কোনো রকম সংজ্ঞা, বহুরূপী ও বিচিত্র লক্ষণসমূহের মধ্য থেকে কতগুলি সাধারণ সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা মাত্র। বর্তমান আলোচনাও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। অতএব, আমি যে সব বিষয় সম্পর্কে কথা বলেছি, সে সব সম্পর্কে মতভেদ থাকা একান্ত স্বাভাবিক।

সোয়া দুই হাজার বৎসর আগে প্লেটো যে আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে কবিদের কোনো স্থান ছিল না। তিনি মনে করতেন কবিরা হচ্ছে মূলত প্রতারক, নিছক ছায়াবাজির দ্বারা শ্রোতাদের ফাঁকি দেবার জন্যই তাঁরা সৃষ্ট পদার্থের অনুকরণ করে থাকে। প্রকৃতি ও জীবন স্রষ্টার নিজ মানস-অনুকৃতি, কাজেই, যেহেতু প্রকৃতি এবং জীবনই কবির রচনার উপজীব্য, সেইজন্য তা সেই অনুকৃতিরই অনুকৃতি (Mimesis), অতএব তা নিকৃষ্ট।

কবি ও কবিতা সম্পর্কে এই মনোভাব কেবল বর্তমানের দৃষ্টিতে নয়, অতীতের পরিপ্রেক্ষিতেও নেহাৎ নৈরাজ্যবাদী। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্লেটো যে দেশ ও যে সমাজের নাগরিক, সেখানে তখন ছিল কবিতারই যুগ। তাহলে, জাতির আত্মপ্রকাশের এই অন্যতম পন্থাকে এইভাবে নস্যাৎ করার মানে কি ছিল? বিচার করলে দেখা যাবে, প্লেটো গ্রীক সমাজের যে শ্রেণীর মুখপাত্র ছিলেন, জীবন সম্পর্কে সেই মহলের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।

কিন্তু পরে এরিস্টটল তাঁর গুরুর এই সিদ্ধান্ত মানলেন না। তিনি এপিক ট্র্যাজেডি কমেডি ও রেটরিকের মূল্যই শুধু নিরূপণ করলেন না, এই

সবের কারুকলা সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনা করলেন। এদিক থেকে তাঁর 'পোয়েটিক্স' ললিতবিজ্ঞানের মহামূল্যবান আদিগ্রন্থ। অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে অবশ্য তিনিও বলেছেন যে, এপিক ট্র্যাজেডি কমেডি এমনকি, বাঁশী ও বীণার ধ্বনি পর্যন্ত সাধারণভাবে সবই অনুকৃতি। তবে উদ্দেশ্য, উপকরণ এবং উপায় এই তিন ব্যাপারে এগুলির মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।

কিন্তু ললিতকলা অনুকৃতি হলেও তা অবাঞ্ছিত কিংবা পরিত্যাজ্য নয়। তার সপক্ষে এরিস্টটল বললেন অনুকরণ করা মানুষের স্বভাব নিতান্ত শিশুকাল থেকেই। এই অনুকরণপ্রীতি একদিকে তাকে অন্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র করেছে, অন্যদিকে তার প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্ভব করেছে। দ্বিতীয়ত, এই অনুকরণে মানুষ আনন্দ পায়। অনুকৃত শিল্পকে যেভাবে আমরা গ্রহণ করি, তাই এ কথার প্রমাণ। কেননা, দেখা যায়, শিল্পের জগতে যে-সব বস্তুকে আমরা সহজেই গ্রহণ ও অনুভব করতে পারি এবং যা থেকে আনন্দ লাভ করতে পারি, বাস্তব জগতে সেগুলির সম্মুখীন হওয়াই হয়তো চরম বেদনাদায়ক। যেমন অনভিপ্রেত বস্তু, রোগ-শোক, দুঃখকষ্ট, মৃত্যুর অভিজ্ঞতা। মূলত জানবার স্পৃহা একটা স্বাভাবিক আনন্দ, আর তা দার্শনিকগণের একচেটে সম্পত্তি নয়; বরং সাধারণ মানুষের মধ্যেও তা প্রবলভাবেই বিদ্যমান এবং সেজন্যই বাস্তবতার অনুকৃতি যে কারুশিল্প, তা তাদের কাম্য। আবার যে ক্ষেত্রে জীবনের পরিচিত বস্তু অনুকৃত হয় না, সেখানেও যদি আনন্দ লাভ ঘটে তাহলে বুঝতে হবে তার উৎস অন্যত্র। অর্থাৎ তখন বিষয়বস্তু নয়, যে ভাষা সুর ও ছন্দে তা রূপায়িত হয়েছে সে সবই তখন হয় শ্রোতা দর্শকের আনন্দ প্রাপ্তির উৎস।

যাই হোক, প্লেটো ও এরিস্টটলের কাব্যদর্শনের বিস্তারিত আলোচনা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু একটি কথা বলার জন্য এ প্রসঙ্গ। সে হল, কালের রূপান্তর এবং বিশেষ বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষিত অনুযায়ী জীবনাচরণের মূল্যবোধে পরিবর্তন আসে এবং অনুরূপভাবে জ্ঞানবিজ্ঞান ও চারুশিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কাব্য বা সাহিত্য-বিচারের নিরিখও বদলায়। প্লেটো-এরিস্টটল থেকে টি. এস. এলিঅট—এমনকি, আজকের দিনের ইউরোপের একজন সাধারণ সমালোচক পর্যন্ত এবং ভারত উপমহাদেশের আচার্য ভরত থেকে রবীন্দ্রনাথ পার হয়ে বর্তমান লেখক

পর্যন্ত এ কথার বহু প্রমাণ প্রত্যক্ষ। এইভাবেই ক্লাসিসিজম রিয়্যালিজম এক্সপ্রেসনিজম ইমপ্রেসনিজম দাদাইজম নিওরোমান্টিসিজম নিওক্লাসিসিজম এক্‌জিস্টেন্সিয়্যালিজম সোসালিস্ট রিয়্যালিজম শিল্পবিচারে এ রকম অসংখ্য মতবাদ জন্ম নিয়েছে।

এখানে আরো একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। তা হল, দুনিয়ার সেরা লেখক শিল্পীরা অনেক সময় জনপ্রিয় লেখক-শিল্পীও বটে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় সমসাময়িক যুগ তাঁদের স্বীকৃতি দেয় না, কিংবা দিতে চায় না। এর পিছনে রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় এবং দলীয় কারণ ছাড়াও নিছক রুচিগত কারণ থাকতে পারে। রাজনৈতিক অনুগ্রহ কি দমননীতি, অথবা কুসংস্কারের অন্ধতা ও আক্রোশ মহৎ শিল্পের ঔজ্জ্বল্যকে বেশীদিন নিষ্প্রভ করে রাখেতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এসবের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সাধারণের মধ্যে রচনার বৃহত্তর প্রচারের পথই উন্মুক্ত করে দেয়। কিন্তু রুচিই যেখানে শিল্প-বিচারের মাপকাঠি সেখানকার অবস্থাটা জটিল। কেননা কোনো জাতির মধ্যে রাতারাতি যেমন একটা রুচি গড়ে ওঠে না তেমনি রাতারাতি তার পরিবর্তনও হয় না এর রূপান্তরের পথ দীর্ঘ ও আঁকাবাঁকা। এইজন্য নতুনতর রুচির ভিত্তিতে সেই রচনার নতুন মূল্যায়ন হতে একটি পুরো শতাব্দী কেটে গেলে বিচিত্রতার কিছু নেই।

কাজেই, আমরা যাকে মহৎ শিল্প বলি, তার মূল্যও কতকটা আপেক্ষিক। এক্ষেত্রে শিল্পের বিষয়বস্তু আঙ্গিক ও জীবন-দর্শনের মধ্যে সমসাময়িক পাঠক শ্রোতা বা দর্শকের মানসিকতার একটা গভীর মিল থাকা বাঞ্ছনীয়। নন্দনতত্ত্ব সূক্ষ্ম ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী, তা থেকে আমি শুধু একটি প্রসঙ্গ বেছে নিয়ে বলব, সমালোচনার, অন্যতম কাজ হল, রচনাকে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করে শিল্প ও বাস্তব জীবনের মধ্যে একটি ভারসাম্যের সৃষ্টি করা। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের মতে, কেবল 'বাক্যং রসাত্মং' হলেই কোনো রচনা কাব্য পদবাচ্য হবে না, অন্যান্য গুণের সঙ্গে তাকে 'সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী'ও হতে হবে। আর এ হওয়া তখনই সম্ভব যখন শিল্প আর জীবন হয়ে ওঠে একাত্ম। মূলত, সমালোচনার কাজই হল, জীবনের পটভূমিকায় শিল্পের মূল্যবিচার।

তবে এক্ষেত্রে দু'টি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত শিল্পের উপলব্ধি, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মিতির পথ প্রশস্ত করা ধর্ম হলেও নন্দনতত্ত্বের ভমিকা আনুষঙ্গিক। তার মানে, ললিতকলার সাধারণীকরণে যেমন তার জন্ম, তেমনি ললিতকলার বিকাশের সঙ্গেই তার অস্তিত্ব। অপরপক্ষে, সৃষ্টি প্রাথমিক এবং মৌলিক। দ্বিতীয়ত, শিল্পের অস্থিমজ্জা রক্তমাংস, এমনকি, প্রাণস্পন্দনও সমসাময়িক জীবনধারা থেকে জন্ম নিলেও তার মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ থাকে মোটা কথায় যা'কে বলা যায় 'চিরন্তন'। অর্থাৎ সব দেশের সব যুগের শিল্পের বেলায়ই সে সব লক্ষণ ও গুণ ঐতিহাসিক আনুপাতিকভাবে সাধারণ। সৃষ্টিকর্ম এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য উভয় দিক থেকেই এ কথা ঠিক। যেমন, প্রথমটির বেলায় বলা যায়, শিল্পসৃষ্টিতে দরকার আঙ্গিকের অপূর্ব নির্মিতি ও দক্ষতা এবং দ্বিতীয়টির বেলায়, সকল রকম শিল্পই জগৎ ও জীবনের মানুষী প্রতিচ্ছবি। উঁচুদরের শিল্পকর্মে এ-দু'য়ের গভীর সমন্বয় অপরিহার্য।

এখন, দেশ বিভাগের পরে পূর্ব বাংলার সামগ্রিক শিল্পকর্মে এই সব লক্ষণ ও গুণ কিভাবে কতটা রূপ নিতে পেরেছে, তাই আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। কেননা, এই বিচার এবং তা থেকে লব্ধ উপলব্ধি ও চৈতন্যের ওপরই ভবিষ্যতের অগ্রগতি অনেকটা নির্ভরশীল।

বিচার করলে দেখা যাবে, গত নয় বৎসরে সাধারণভাবে এখানকার শিল্পসৃষ্টি ও শিল্পবোধ পূর্বের অবস্থা থেকে অনেকটা উন্নীত হয়েছে। কিন্তু মৌলিক সৃষ্টিকর্মে আমাদের কতদূর অগ্রগতি হল, তার ফিরিস্তি বর্ণনায় উৎফুল্ল হওয়ার মতো কিছু আছে কিনা সন্দেহ। কিছু সংখ্যক নিষ্ঠাবান শিল্পী থাকলেও এখানে সঙ্গীত গতানুগতিক ও পুচ্ছগ্রাহী, নৃত্য ও অভিনয়কলা এখনো শৈশবই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। চিত্র-কলার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতির সূচনা হয়েছে বলা যেতে পারে; কেননা, এ পর্যন্ত সারা প্রদেশে অন্তত ষোলটা প্রদর্শনী হয়েছে এবং সেগুলির অন্তত চার ভাগের এক ভাগ উল্লেখযোগ্য; স্বল্প উপকরণ এবং সীমাবদ্ধ পরিবেশে থেকেও আমাদের চিত্রশিল্পীরা কিছু কিছু কাজ করছেন, ভালো আঁকবার চেষ্টা করছেন, এইটে নিঃসন্দেহে আশার কথা। কিন্তু তবু এ কথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, এখানকার চিত্রকলা একান্ত-ভাবেই ইন্দো-ইউরোপীয় ধারার অনুসরণমুখী এবং কোনো কোনো শিল্পী

ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব পথ সৃষ্টির চেষ্টা করলেও এখনো পুরোপুরি সার্থক হয়ে ওঠেন নি।

সাহিত্যের অবস্থাও কতকটা তথৈবচ। এ-যাবত কিছু সংখ্যক ভালো কবিতা, ছোটগল্প, নাটিকা এবং কয়েকটি ভালো উপন্যাস ও নাটক রচিত হয়েছে ঠিক, আর একটা দেশের সাহিত্যিক ভিত্তি-নির্মাণে এগুলির মূল্যও কম নয়। কিন্তু তবু কি প্রশ্ন করা যায় না যে, পরিমাণ এবং গুণের দিক থেকে এ নেহাৎ-ই অকিঞ্চিৎকর?

এখন প্রশ্ন উঠবে, এই অপ্রাচুর্য ও বন্ধ্যাত্বের কারণ কি? এ কি নেহাৎ-ই শিল্পীদের ব্যক্তিগত অক্ষমতা, না এক্ষেত্রে অন্য কারণও আছে? সাহিত্যই আমার সাধনার বিষয়, কাজেই এ প্রসঙ্গে শুধু সাহিত্যের দিকটাই আমি আলোচনা করতে চাই। অবশ্য শিল্পের অন্যান্য মাধ্যম সম্পর্কেও এই আলোচনা প্রায় সমানভাবেই সত্য হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমার মতে, সাহিত্যের এই অনগ্রসরতার পিছনে দুই প্রকৃতির কারণ বর্তমান। প্রথম সমষ্টিগত, দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত। প্রথম কারণটি সম্পর্কে এই বলা যায় যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুষঙ্গী হিসেবে যা' শুরু হয়েছিল এবং দেশ বিদেশী শাসনমুক্ত হওয়ার পরেও যাকে কৃত্রিমভাবে অসম্ভব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সেই পরিকল্পিত শক্তির চাপই সৃষ্টির ক্ষতি-সাধন করেছে বেশি; আর তা'হল সাহিত্যের ওপরে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবাদর্শের অতিরেক। আমরা জানি, একটা লেখা যখন সত্যিকারের শিল্প হয়ে ওঠে, তখনই তা জাতির অক্ষয় সম্পদে পরিণত হয়; আর এক্ষেত্রে শিল্প হিসেবেই শিল্পের মূল্য। কিন্তু এ-দেশে দেখা গেল, সরকারের অনুগ্রহ-পুষ্ট এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও লেখক উল্লিখিত আদর্শবাদকে রচনার বিষয়বস্তুতেই শুধু গ্রহণ করলেন না, সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি সমস্যাকেও তাঁরা এই নিরিখেই বিচার করলেন। এমনকি, শিল্পে যাঁরা প্রগতিসত্তার কর্মী তাঁদের মধ্যেও এই বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেল; তাঁদের কাছেও শিল্পের নিজস্ব সত্তার উর্ধ্বে অনেকটা রাজনৈতিক চেতনাই হল শিল্প-বিচারের মাপকাঠি। কিছুসংখ্যক ভালো রচনা বাদ দিলে এই সবের ফল হল বিভ্রান্তি, নৈরাজ্য ও অক্ষম অনুশীলন। আর

তার প্রথম নজীর হল, সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রথমোক্ত শ্রেণীর একান্ত অবাস্তব মতবাদ।

এখানে প্রথমে কিছুটা ভূমিকা করে নেয়ার প্রয়োজন আছে। ব্যাপক অর্থে বলা যায়, ললিতকলার যে-কোনো শাখায় চলতিকালের সৃষ্টি ও তার নতুন পরিচর্যার মানে ঐতিহ্যেরই রূপান্তর ও বিকাশ। আবার ভাষা যে শিল্পের মাধ্যমে, তার সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভাববস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে চিত্রকলার মাধ্যমে ও ব্যবহারিক চরিত্রে নতুন বিন্যাস এলেও তার স্বাধর্ম্য অনেকটা স্থির। তেমনি কোনো প্রতিভার দানে সঙ্গীতের সুরে নবতর উজ্জীবন তার অচঞ্চল শাস্ত্রীয় কাঠামোকে বিপর্যস্ত করতে পারে না। কিন্তু অপরপক্ষে, সাহিত্যের উর্ধ্বেও ভাষার একটা নিজস্ব জীবন আছে, যার জন্য তার অস্থিমজ্জায় রূপায়িত শিল্পের ঐতিহ্য গ্রহণ-বর্জনের শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

তাই ললিতকলার অন্যান্য বিভাগের বেলায় ঐতিহ্যের কিছুটা সীমীকৃত অর্থ থাকলেও সাহিত্যের বেলায় তার ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। ঐতিহ্য সাহিত্যের ইতিহাস নয়, বিভিন্ন যুগে লেখা জ্ঞাত-অজ্ঞাত পুঁথির বিবরণ নয়; বরং ঐতিহ্য অর্থে আমরা সেই শক্তিকেই বুঝব যা ক্রমবিবর্তন-ধারায় অতীতের মধ্যে থেকে এসে বর্তমানের সাহিত্যবস্তু ও ভাষার শিরায় শিরায় রক্তসঞ্চার করে চঞ্চল হয়েছে।

কাজেই ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান রূপ থেকে ঐতিহ্যকে কিছুতেই আলাদা করে দেখা যায় না।

আমাদের সংস্কৃতির তথাকথিত কর্ণধারেরা সাহিত্যের ঐতিহ্যের এই গুরুতর প্রশ্নটার যে-ভাবে মীমাংসা করলেন, তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথমেই তাঁরা ভাবলেন, পাকিস্তান আন্দোলনের সাফল্য ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বঝি সে প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল। কেননা, এই আন্দোলনের মূল প্রেরণা ছিল ভারতীয় মুসলমানেরা এক আলাদা জাতি, তাদের পৃথক তাহজীব-তমুদ্দুন ও জীবনযাত্রার নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে, যার সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য একটি সার্বভৌম স্বতন্ত্র বাসভূমির প্রয়োজন। কাজেই সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নে তাঁরা বললেন, রাষ্ট্রে জীবনে ও শিল্পে ইসলামী সভ্যতার রূপদানই এখন একমাত্র কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা একান্ত কৃত্রিমভাবে গদ্যে ও পদ্যে অজস্র আরবী-পারসী শব্দ আমদানী

করতে লাগলেন। এই সঙ্গে নেহাৎ ব্যক্তিগত মানসিক আবেগকেও আরব্য-পারস্য ইতিহাস-উপাখ্যানের ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে ঢালাই করবার একটা ব্যাপক চেষ্টা চলল। এই দলের একজন মুখপাত্র লিখলেন, প্রয়োজন হলে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিতে হবে। আর এই মানসিকতার চরম প্রকাশ, আরবী হরফে বাংলা লেখা এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টার মধ্যে।

এখন প্রশ্ন হল, সাহিত্যের দিক থেকে এ প্রচেষ্টা কতটা যথার্থ ছিল। একথা অবশ্য ঠিক যে, কোনো লেখক যদি এই ইতিহাসের সঙ্গে নিজকে যুক্ত করতে সত্যিকারের আবেগ অনুভব করেন, তা'হলে সেখানে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না; কেননা, সেখানে শিল্পসৃষ্টি তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু বাইরে থেকে কোনো নির্দিষ্ট ভাবাদর্শকে শিল্পের ওপরে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা একান্ত উদ্ভট। বিশেষ করে, পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে যেখানে সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা এক।

একথা আজ সর্ববাদীসম্মত যে, সৃষ্টির জন্য কোনো কবি বা লেখকের পক্ষে ঐতিহ্য-চেতনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। টি. এস. এলিঅটের জীবনদর্শন ও তার পরিণতি সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ থাকলেও ঐতিহ্যের ওপরে তাঁর বক্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য। 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তি-প্রতিভা'র আলোচনা-প্রসঙ্গে বিশেষ জোর দিয়ে তিনি বলেছেন, 'ইতিহাস-চেতনা কোনো ব্যক্তিকে কেবল তার সমসাময়িক লেখকদেরকে অস্থিমজ্জায় নিয়েই লিখতে বাধ্য করে এমন নয়, বরং হোমার থেকে শুরু করে ইউরোপের সাহিত্য এবং এর মধ্যে তাঁর নিজের দেশের সমগ্র সাহিত্যেরও সমান উপস্থিতি ও বিন্যাস অপরিহার্য।'

ইউরোপীয় কবিদের সম্পর্কে এলিঅটের কথা আমাদের দেশেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সভ্যতার উন্মেষকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে যে সব শিল্পী সৃষ্টি করে গেছেন, তাঁদের ক্লাসিক আজকের পৃথিবীর মূল্যবান সম্পদ। কোনো দেশের কোনো কবি যদি সে ক্লাসিক থেকে তাঁর শিল্পের মাল-মশলা আহরণ করেন, তা'হলে সেখানে তাঁর কাব্যের গভীরতা, বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের পথই প্রশস্ত হবে। পাউণ্ড চীনে ছড়া ও লোকগাথার অনুবাদ করেন, এলিঅট গ্রীক মিথোলজি থেকে শুরু

করে উপনিষদ পর্যন্ত ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তার পিছনকার প্রেরণা এই অর্থেই মূল্যবান।

কিন্তু এই ইতিহাস-চেতনার অর্থ অতীতের কংকালকে বর্তমানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া নয়। ইংরেজ কবি-সমালোচকের ভাষায়ই আবার বলা যায়, 'কেবল অতীতের অতীতটাই নয় বরং অতীতের বর্তমানটাই ইতিহাস-চেতনার উপজীব্য।'

কাজেই মুক্তবুদ্ধিতে বিচার করলে দেখা যাবে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের কতগুলি ধর্মীয় রচনা এবং পুঁথি ও লোকসাহিত্যই শুধু নয়, চর্যাপদ থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যত সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার সবই আমাদের ঐতিহ্য। একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও লেখক না চাইলেও, সাহিত্যের এই ধারা জগৎ-বিধির অনিবার্য কাণেইর আমাদের মানস শরীরে রক্ত সঞ্চার করেছে; মূলত, ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান রূপ থেকে সে ধারা অবিচ্ছেদ্য। কেননা, বর্তমানে সে অতীতের বর্তমানটা আমাদের মানস-কর্মে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গভীরভাবে একাত্ম হয়ে আছে। কাজেই যখন এই বর্তমানের উজ্জীবনের প্রশ্ন আসে, তখন সমাজ ও ও সংস্কৃতির ক্রম-রূপান্তরিত রূপের সঙ্গে সেই অতীতের একটা গভীর সমন্বয় স্বাভাবিকভাবেই অনিবার্য। সেইজন্য অতীতের কোনো ধর্মীয় সংস্কার, আচার ব্যবহার নীতি কিংবা শাস্ত্রীয় আদর্শের হুবহু অনুকৃতির চেষ্টা কেবল জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস অথবা স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা থেকেই জন্ম নিতে পারে, আর তা যে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের পথ নয়, তা বলাই বাহুল্য। তাই রাষ্ট্রীয় আদর্শকে রূপ দেয়ার জন্য নয়, বরং কোনো সাহিত্যকর্মীর কাছে প্রাচীন মিশর, ভারতীয় কিংবা গ্রীক-পুরাণ যে অর্থে মূল্যবান, আরব অথবা পারস্যের ইতিহাস অথবা পুরাণ তার কাছে কেবল মাত্র সে হিসেবেই মূল্যবান বিবেচিত হতে পারে।

এদিকে এই দলেরই নরমপন্থী যারা, বিভাগোত্তরকালে তাঁদের কেউ কেউ বললেন, পূর্ব বাংলার লোকসাহিত্যই এখানকার সাহিত্যের ঐতিহ্য। কিন্তু আগে যে বিশ্লেষণ করেছি সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথাটা আংশিক সত্য। তবু তার আলোচনা চলতে পারে, সাহিত্যের নির্মাণপথে তার সম্ভাব্য ভূমিকা আছে বলেই।

প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি, লোকসাহিত্য আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশ। তবে যারা বিশেষভাবে লোক-সাহিত্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন, তাঁদের মতবাদের উৎস হচ্ছে, আমাদের এমন কিছু করতে হবে যার রূপ হবে পশ্চিম বাংলার সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র। তাদের ধারণায়, সে রূপসৃষ্টির একমাত্র পথ, এখানকার লোকসাহিত্যের চরিত্র ও আঙ্গিকের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করা।

এ প্রশ্নে তাঁদের দৃষ্টিপথে ছিল আইরিশ রিভাইবালিজমের দৃষ্টান্ত। উনিশ শতকের শেষ দশক ও বিশ শতকের প্রথমদিকে এই 'কেলটিক' রিভাইবাল ইংরেজী সাহিত্য-জগতে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সরাসরিভাবে না হলেও, এর প্রেরণা নিহিত ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় স্বায়ত্তশাসন অর্জন আন্দোলনের মধ্যেই। তার উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমত দেশের প্রাচীন ইতিহাসের আবিষ্কার এবং ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্জন্ম দান; দ্বিতীয়ত, প্রাচীন প্রেরণা এবং যথাসম্ভব প্রাচীন ভাষায় সাহিত্যের এক অভিনব রূপ সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা সাহিত্যিকর্মী পরস্পর সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন; তাঁদের কাজ ছিল আয়া-র্ল্যাণ্ডের অতীতের এখনও যা কিছু আছে তার সংগ্রহ এবং সঙ্গে সঙ্গে সরল ও আদিম কৃষিজীবনে যে ঐশ্বর্য বর্তমান তার অনুসন্ধান। এরপর গদ্যে ও পদ্যে প্রাচীন বীরদের নতুন জীবন দান করা; তাছাড়া সাধারণ গ্রাম্যজীবনের আচার কুসংস্কারের মধ্যে যে বিশ্বাস ও বৈচিত্র্য আছে, সে গুলির মর্মমূলে প্রবেশ করে তাদের আদিম প্রেম-ভালবাসার বাস্তব রূপায়ণও তাদের সাধনা ছিল। এই কর্মীদের মতে, এরপর সাহিত্যের ভাষাও হবে সরল এবং গ্রাম্য; তবে প্রাচীন গ্যেলিক ভাষা দুর্বোধ্য হওয়ায় এমন একটি ভাষা আবিষ্কার করে নিতে হবে যা হবে লোকচরিত্র প্রকাশের উপযোগী, অথচ শিল্পের খাতিরে বেশ কিছুটা মার্জিত। এমনি ধরনের একটি ভাষা-নির্মাণের জন্য লেডী গ্রেগরী ও জে.এম. সিঞ্জের পরিশ্রম সার্থক হয়েছিল। তাঁদের এই ভাষা স্থূল অথবা হালকা হয়নি, সিঞ্জের ট্র্যাজেডি 'রাইডার্স টু দি সী' এবং ট্র্যাজি-কমেডি 'দি প্লে বয় অব দি ওয়েষ্টার্ন ওয়ার্লড'ই তার প্রমাণ। এই গোষ্ঠীর দু'জন প্রধান শিল্পকর্মী ছিলেন ইয়েট্‌স ও জর্জ রাসেল। জর্জ রাসেলের গীতিকবিতা এবং

ইয়েট্সের কাব্য আইরিশ সাহিত্য আন্দোলনের দেশজ চরিত্রকে বিশ্ব-সাহিত্যের আসনে স্থির করেছে।

আইরিশ রিভাইবালিজমের বিস্তারিত আলোচনা এখানে মুখ্য নয়, আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাই শুধু উল্লেখ করলাম।

সাহিত্যক্ষেত্রে এমনি ধরনের সংঘবদ্ধ সচেতন পরীক্ষা কতটুকু সফল হতে পারে সে এক প্রশ্ন ; তবু এর সম্ভাবনাকে বিচার করে দেখা যায়, কেননা, সকল শিল্পের সঙ্গে ব্যক্তির সচেতন প্রয়াস যুক্ত। পূর্ব বাংলার লোকসাহিত্যের আয়তন বিরাট এবং তার বৈচিত্র্যও কম নয়। বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে, মেঘনা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে, সীমান্তের পার্বত্য এলাকায় এবং সমগ্রভাবে সারা দেশ জুড়ে প্রকৃতিকে ভালবেসে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে যে মানব-সন্ততি চলে এসেছে তাদের রূপসৃষ্টি আধুনিক কালের মানুষের হাতে এখনো পুরোপুরি এসে পৌছয়নি, সে গুপ্ত রত্নের মধ্যে আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের সঙ্কটমুক্তির সন্ধান আছে কিনা, কে জানে। মেয়েলি ছড়া, বিবাহের গান, সারি জারি রাখালি গান, মারফতি-মুর্শিদা বাউল গান, সাঁওতালী ঝুমুর, ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালী গান, যেগুলির সঙ্গে আমাদের কিছু কিছু পরিচয় আছে, তাতে একদিকে দেখতে পাই বাস্তব মানব সম্পর্কের হাসিকান্না বন্ধুত্ব-ভালোবাসা ও শান্তি-অন্বেষার পরিচয়, অন্যদিকে বাংলার কোমল-কঠোর প্রকৃতির উপস্থিতি। কেবল ইতিহাসের উপকরণ হিসেবেই নয়, শিল্পসৃষ্টি হিসেবেও এ সবের মূল্য অপরিসীম। কেননা, এগুলিতে বিচিত্রভাবে জীবনের উপলব্ধির পরিচয় মূর্ত হয়েছে। এগুলি ছাড়াও রয়েছে দোভাষী পুঁথি, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগাথা ও পালাগান। দোভাষী পুঁথির অনেকটা জুড়েই ধর্ম, বীরত্ব ও প্রেমের লৌকিক রূপের প্রকাশ। এগুলিতে সাধারণ্যের চিন্তা, রুচি ও কল্পনার পরিচয় রয়েছে, তাই এগুলি অনুশীলনের বস্তু। আমাদের লোকসাহিত্য যে জীবনবোধ ও বাস্তবতার গুণে কত ধনী তার নিদর্শন গাথাকাব্য 'ময়মনসিংহ গীতিকা'।

কাজেই, শেষ পর্যন্ত সাধারণভাবে বলা যায়, লোকসাহিত্যের কাহিনী, ভাষা, শব্দ, উপমা ও রূপক নিয়ে আধুনিক সাহিত্য-কর্মীদের পরীক্ষা

নিরীক্ষার অবকাশ আছে। তবে তা কতটুকু সফল হবে, এর সমন্বয়ে কোনো মহৎ সৃষ্টি হয়ে গেলেই তার বিচার সম্ভব।

কিন্তু এসব হল শিল্পকর্মের আনুষঙ্গিক প্রশ্ন। অপরপক্ষে সৃষ্টির প্রেরণা জাগ্রত হলে শিল্পী সেই মুহূর্তেই দু'টি সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এবং সেগুলি একান্ত প্রাথমিক। তা'হল প্রথমত, উপকরণ, দ্বিতীয়ত আঙ্গিক। শিল্পের আদর্শসম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে; কিন্তু সবক্ষেত্রেই এ দু'টি সাধারণ। মূলত এই হল, সৃষ্টির প্রাথমিক ভিত্তি।

এর প্রথমটি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, শিল্পবস্তু বা উপকরণ হচ্ছে সেই জিনিস যা না হলে সৃষ্টির ভাবনাও অসম্ভব। প্রশ্ন হবে, সেই বস্তু কী। এর জবাব এক কথায়ও দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু যেহেতু এ প্রশ্ন শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেজন্য অন্যান্য প্রকরণের মতোই তা বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

অতি প্রাচীনকালে গ্রীক সোফিষ্ট প্রোটাগোরাস বলেছিলেন, জগতের সবকিছুর মানদণ্ড হচ্ছে মানুষ। শিল্পসাহিত্যে একথার সত্যতা যেমন করে নির্ণীত হয়েছে, তেমনি বুঝি আর কোনো ক্ষেত্রেই নয়। এক কথায় বলা যেতে পারে, মানুষ শিল্পের স্রষ্টা এবং মানুষ উপকরণও। ফসল-বোনা ও ফসল-কাটার সময়ে নবান্নের উৎসবে নৃত্য-গীত সহযোগে আদিম মানুষের যে প্রাণের উল্লাস, তাতেই শিল্পের জন্মকাহিনী নিহিত। তাদের আবেগ অনুভূতি, আনন্দ-বেদনা, ভাষা এবং রং-রেখাকে আশ্রয় করার আগে দেহভঙ্গিমা এবং কণ্ঠস্বরের রাগিণীতেই রূপ পেয়েছে, সেজন্য নৃত্য এবং সঙ্গীতকে বলা হয় আদিশিল্প। একদিকে হিংস্র জীবজন্তু ও উন্মুক্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অন্যদিকে জীবিকা-আহরণের প্রচেষ্টা, এ দুই প্রাথমিক প্রয়োজনেই মানুষ সংঘবদ্ধ হতে শিখল; পরস্পরের মনের ভাব আদান-প্রদানের জন্য তৈরী করল সে প্রতীক-আরোপিত সাঙ্কেতিক ধ্বনির, আর এরই নাম হচ্ছে ভাষা। বিশ শতকের এক মনীষী বলেছেন, সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে এপর্যন্ত মানুষ যত আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে ভাষার আবিষ্কার। কথাটা মিথ্যে নয়। মানুষ স্বল্পায়ু প্রাণী, গড়ে পঞ্চাশ বছরের পরমায়ুও তার নেই, অথচ এই অকিঞ্চিৎকর সময়ের মধ্যেই তাকে গুরুতর দায়িত্ব পালন করতে হয়। শ্রমের অনুষঙ্গী বুদ্ধি-মনন এবং আবেগের সহস্র ধারায় তার জীবনের যে

সামগ্রিক প্রকাশ, তার শ্রেষ্ঠ অংশ ভবিষ্যতের সন্তান-সন্ততিদের জন্য সে রেখে যায় ভাষার মাধ্যমে। কাজেই যে শিল্পের আশ্রয় ভাষা তার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

অতএব বলা যেতে পারে, নৃত্যের মুদ্রা, সঙ্গীতের রাগিণী আর কবিতার ভাষা যুগে যুগে বিচিত্ররূপে মানুষকেই প্রকাশ করেছে। যেখানে ভগবানের মহিমা কল্পনা, সেখানেও দেখি তার মানুষী রূপ, আবার যেখানে বহিঃপ্রকৃতির অনন্তলীলা মূর্ত, সেখানেও মানুষেরই প্রতিচ্ছায়া।

কাজেই, আমি যদি শিল্পী হতে চাই, তা'হলে আমার প্রথম এবং শেষ কাজ হচ্ছে মানুষকে জানা। মানুষের সামগ্রিক পরিচয় চাই, নইলে ভাষায় যত কারুকার্যই থাক, রঙে যত চ্ছটাই থাক, সবকিছু ব্যর্থ। বালজাক ব্ল্যাককফি খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন এবং সত্তর বছর পর্যন্ত তাঁর স্বপ্নের নারীকে কাছে আনতে পারেননি, এর পিছনে ছিল কিসের প্রেরণা, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অভিজাত কাউণ্ট টলস্টয় সকল শান্তি ও নিরাপত্তাকে অস্বীকার করে শেষ বয়সে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন; মানুষকে জানার জন্য এ শিল্পীরই অভিযাত্রা। মূলত, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের জীবনী আলোচনা করলে দেখতে পাই একেকজন তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করেছেন, সহস্ররূপে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বাইরে। তাদের জীবন এবং তাদের সৃষ্টি এক সমুদ্রসঙ্গমে এসে মিশেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি শিল্পীর সাধনা হচ্ছে জীবন-সাধনা এবং সে জীবন নিঃসন্দেহে মানুষেরই জীবন। একদিকে তা সামগ্রিক এবং অন্যদিকে তা শিল্পীর ব্যক্তিগত।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, শিল্পের অবলম্বন যে মানুষ সে কি নিরলম্ব ধোঁয়াটে আধ্যাত্মিক কিছু, না তার অন্য রূপ আছে? এখানে সমাজতত্ত্ব এসে যায়, কেননা সমাজের বাইরে মানুষের অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীর আদিম সাম্যবাদ থেকে দাস ও সামন্তসমাজ এবং এর পরে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলির যে পরিচয় মূর্ত হয়েছে, এখানে তার বিশ্লেষণ অনাবশ্যক, শ্রেণী-সমাজে শিল্পীর ভূমিকার চরিত্র কি, আমি শুধু সেদিকেই ইঙ্গিত করব।

শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের বাঁচার প্রয়োজনে, এ আমরা দেখেছি, কিন্তু পরবর্তীকালে ধনতন্ত্রের সংকটকালে সে-শিল্প 'আর্টস্ ফর আর্ট্ সেক' এর গোলকধাঁধাঁয় দায়িত্ব হারিয়েছে একথাও অস্বীকার করার যো নেই। এই মধ্যবর্তী সময়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে রাজা বাদশাহরা শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তা দেখতে পাই। বিশেষ করে, প্রাচীন মহাকাব্যগুলি তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা ঐতিহাসিক সত্য। হোমারের ইলিয়াড ওডিসি, বাল্মীকি-ব্যাসের রামায়ণ মহাভারত, অথবা ফেরদৌসীর শাহনামা সবক্ষেত্রেই একথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য।

এ অবশ্যই ঠিক যে, মধ্যযুগে রাজার বন্দনাগান ছাড়া কাব্য রচনা প্রায় অসম্ভব হলেও সেগুলি জনসাধারণের মুখে মুখেই চলতে থাকত, শালীন-সাহিত্যের মর্যাদা পেত না, কিন্তু তবু এখানে একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না। তা হল, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্পীদের ওপর শাসক-শ্রেণীর ব্যাপক প্রভাব থাকলেও যেখানে শিল্পী সত্যিকারের শিল্পী অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সৎ এবং জীবনানুগ সেখানে তাঁর সৃষ্টি ব্যর্থ হতে পারে না, সেখানে রূপক-কাহিনী, অথবা চরিত্রের ছদ্মবেশে জন-সমাজের আবেগ-অনুভূতি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত হতে বাধ্য। সৎ শিল্পীর সৃষ্টিতে মূল প্রেরণা হচ্ছে সামাজিক বাস্তবতা, বিভিন্ন যুগে এই উক্তির সত্যতা নির্ণীত। এই হিসেবে রামায়ণ-মহাভরত, ইলিয়াড-ওডিসি, অথবা শাহনামার অজস্র কাহিনী বিশাল গণজীবনেরই প্রতিকৃতি, মহাকাব্যের বীর নায়ক, সত্যরক্ষী রাজা ও অন্যান্য সহস্র চরিত্র এবং তাদের কার্যকলাপ, গণমানুষের অমূর্ত আকাঙ্ক্ষারই প্রতীক। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের উদহারণ দিলে, দেখতে পাই, শ্রেণীর দিক থেকে বালজাক ছিলেন ফ্রান্সের উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিভূ, কিন্তু যেহেতু তিনি সৎ-শিল্পী, সেজন্য তার রচনায় নিজের শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্যতার কাহিনীই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শিল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে এখানে এর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। এখন তার আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

দেহ এবং আত্মার সমন্বয় যেমন প্রাণী, তেমনি বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের যথাযথ সম্মিলনেই শিল্প। এককে ছেড়ে, অথবা দুর্বল রেখে অন্যের সাফল্য অসম্ভব; আর এক্ষেত্রে শিল্পীর পক্ষে ইতিহাস-চেতনা যে

অপরিহার্য, তা বলাই বাহুল্য। একজন শিল্পকর্মীর পক্ষে কি রচনা করব, এর চাইতে কেমন করে রচনা করব তার গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। আমাদের মহান পূর্বসুরিগণ যারা জীবনের সাধনায় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আঙ্গিক মণ্ডন করে গেছেন, তার সঙ্গে গভীর পরিচয় রাখতে হবে, নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করার প্রশ্ন তার পরে; শিল্পীরা যে আজীবন শিক্ষার্থী, এদিকে থেকেও তা সত্যি। ফরাসী ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের কথা আমরা জানি। ভাষা-পরিচর্যার ক্ষেত্রে দায়িত্বের চরম দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। একটি শব্দের মনোমত বিন্যাসের জন্য বত্রিশ দিন ব্যয় করা শুচিবাইয়ের পরিচয় মনে হওয়া স্বাভাবিক, অথচ তিনি তা করেছেন। এইজন্যই তাঁর সৃষ্ট ফরাসী ভাষা যেমন উজ্জ্বল, তেমনটি আর কারো নয়। তাঁর কাছেই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার মোপাসাঁ হাতেকলমে গল্প লেখা শিখেছিলেন। আর এই দুই মহান শিল্পীর যোগাযোগটা অর্থহীন হয়নি।

শিল্পক্ষেত্রের যারা নতুন কর্মী, তাদেরকে এ ব্যাপারটা বিশেষভাবে প্রণিধান করতে হবে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, চিত্রকলা, নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয়—তিনি ললিতকলার যে-কোনো ধারার কর্মীই হোন না কেন, সেই নিজস্ব ধারার আঙ্গিক আয়ত্ত করার বিশেষ সাধনা তাঁর অবশ্য কর্তব্য।

কেননা, জীবন সম্বন্ধে তাঁর যে বক্তব্যই থাক, আঙ্গিকের মধ্যে সার্থকতা হলে ব্যর্থ তা হতে বাধ্য। রচনা পদ্ধতির দুর্বলতায় বলিষ্ঠ প্রগতিশীল জীবনবোধও নিরর্থক হয়ে যায়, এর উদাহরণ বিরল নয়। পাঠক, দর্শক অথবা শ্রোতার অনুভূতিকে জাগ্রত করতে না পারলে রচনার কোনো দাম নেই। আর এজন্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে আঙ্গিকের সিদ্ধি একান্ত প্রয়োজন।

এইসব দিক থেকে পরিশেষে বলা যায়, আদর্শ ও ঐতিহ্যবোধ, উপকরণ ও আঙ্গিক, সমস্ত কিছুই বিফল হয়ে যাবে যদি শিল্পীর সৃষ্টির ক্ষমতা না থাকে। অক্লান্ত চেষ্টায় দর্শন, শ্রবণ বা পাঠযোগ্য চলনসই রচনা সম্ভব এবং এগুলির বিশেষ প্রয়োজনও আছে; কিন্তু সৃষ্টির আগুন না থাকলে সকলরকম মালমশলা পুড়িয়ে তা থেকে সুন্দর আনন্দময়, মঙ্গল বা প্রেরণা-দায়িনী শিল্পপ্রতিমা গড়ে তোলা অসম্ভব। কেননা, সকল রকম শিল্পই একান্তভাবে ব্যক্তি-প্রতিভার দান। এ কথার অর্থ, সৃষ্টিকর্মে ব্যক্তির

ভূমিকাই প্রাথমিক এবং অনিবার্য। যে নৃত্যে বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ ও চিত্ত চঞ্চল হয়, তার জন্য প্রয়োজন উর্বশীর; অর্ফিয়ুস ছাড়া তাঁর বাঁশরীর কোন দাম নেই; 'রেক্স ইদিপাস' রচনার জন্য সোফোক্লিসের প্রয়োজন এবং 'মোনালিসা'র জন্য প্রয়োজন লিওনার্দো দা ভিঞ্চির। অতএব, ব্যক্তি-প্রতিভাই শিল্পের সর্বনিয়ন্তা এবং সংস্কৃত আলঙ্কারিকের মতে, তা হল, 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'।

শিল্পীর ব্যক্তি-সত্তার উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় এক্ষেত্রে দেশের প্রকৃতি, লোকচরিত্র—তাদের জীবন-ধারণ ও সামাজিক ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য, এবং তার রাজনৈতিক ও ঐতিহ্যগত অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হল এ মনে করার কোনো কারণ নেই। জীবনের এই সামগ্রিক শক্তি সমন্বিত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই শিল্পে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তাই কোনো একজন কারুকর্মী যদি সতিকারের শিল্পী হন, তাহলে চোখে আঙুল দিয়ে এসবের প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের কোনো প্রয়োজন হয় না। কেননা, শ্রেষ্ঠশিল্প একদিকে সবচেয়ে বেশি সমসাময়িক ও জাতীয়, এবং অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি চিরন্তন ও আন্তর্জাতিক।

আর এ ব্যাপারে সমালোচকদের কাজ হল, শিল্পের ওপর নিজেদের মতামতের চাপ সৃষ্টি করা নয়, বরং জীবনের সকল শক্তির পটভূমিতে শিল্পের স্বধর্মের দিক থেকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে তার স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথ প্রশস্ত করা। এক্ষেত্রে সরকার পরিবেশক-প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকগণেরও বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। সরকারের উচিত, মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল শিল্পীর জন্য ব্যাপক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে এমন একটা মুক্ত পরিবেশ জাগ্রত করে তোলা, যাতে সর্বত্র পারস্পরিক একটা সহিষ্ণু সুস্থ প্রতিযোগিতার আবহাওয়া গড়ে উঠতে পারে। এই সঙ্গে পরিবেশনকারীদের হতে হবে শুধু ব্যবসায়ী নয়, বিবেচকও এবং জনসাধারণকে হতে হবে রস বক্তা ও নিজের দেশে একটা মহান মানবীয় সংস্কৃতি গড়ার কাজে তাঁদের স্বকীয় ভূমিকায় আস্থাবান আর সক্রিয়।

এইভাবে সকলের সম্মিলিত কাজের মৌসুমীতেই শুধু আসতে পারে আমাদের মানস-কর্মের মৃতপত্রের রাজ্যে শত পুষ্পের নতুন বসন্ত।

১৯৫৬

ভাষা ও ভাষাবিচার

জৈবিক ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষ কালক্রমে যতগুলি সম্পদের অধিকারী হয়েছে, সে-সবের মধ্যে ভাষা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। জন্মের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ তার নিত্য সঙ্গী। শুধু তাই নয়, তার সারাজীবনে যে অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঞ্চয়, তার একটা বিরাট অংশ উত্তরপুরুষের জন্য সে রেখে যেতে পারে অনেকটা ভাষারই মাধ্যমে; কাজেই, মৃত্যুর পরেও, ভাষাই তার অমরত্বের অন্যতম ধারক ও বাহক। অবশ্য সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্রকলার মধ্যেও তার একরকম পরিচয় ফোটে, কিন্তু ভাষার তুলনায়, সে-সবের পরিধি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। অতএব, শুধু মনের ভাব আদান-প্রদানের জন্যই নয়, জীবনের সংগ্রাম এবং বিকাশের জন্যও ভাষার ভূমিকা সুদূরপ্রসারী।

ভাষা কথাটাকে রূপকের জগতে ঠেলে দিলে তার ব্যাপকতর অর্থও সম্ভব। আর সেই হিসেবে বৃষ্টির রিমিঝিমি শব্দ, নদীর কুলুকুলুধ্বনি অথবা তারকার ঝিকিমিকি প্রভাকে কেউ ভাষা বললে আপত্তির কিছুই থাকবে না, কিন্তু প্রকৃতির ওপরে রূপক আরোপে যে তত্ত্ব-বিচার, তার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। তবে পাখির কাকলি ও জীবজন্তুর বিচিত্র ধ্বনিকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অর্থে ভাষা বলা যেতে পারে। কারণ, তাদের সেই শব্দ অন্ততপক্ষে আনন্দ, বেদনা ও উত্তেজনার প্রকাশ। কিন্তু সাধারণ এবং মৌল অর্থে ভাষা বলতে আমরা মানুষের কণ্ঠ-নিঃসৃত অর্থবান ধ্বনিমালাকেই বুঝে থাকি।

কোন্ অজ্ঞাত মানব-গোষ্ঠীর মানস-সরোবর থেকে জন্ম নিয়ে ভাষা নিরবিচ্ছিন্ন নদী-প্রবাহের মতো বয়ে চলেছে; বর্তমান জগতের মহামানবের সাগর-সঙ্গমে এসে বিচিত্র কলকল্লোলের সৃষ্টি করেছে ঠিক, কিন্তু তার এই পথচলার তরঙ্গ সব-সময়ই সামনের দিকে প্রসারিত।

এইভাবে বিকাশ ও রূপান্তরের পথে ভাষায় যে সামগ্রিক ঐতিহাসিক রূপ ও ধারা, তার বিচার, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে কতকগুলি

সাধারণ ধর্মের আবিষ্কার হয়েছে। আর এর পিছনকার যে সত্রগত ভিত্তি, তারই নাম ভাষাবিজ্ঞান।

ভাষার অন্যতম কাজ যে ভাবের আদান-প্রদান, ললিতকলার মাধ্যমেও তা কিছুটা সমাধা হতে পারে। সঙ্গীতের সুরে, নৃত্যের ভঙ্গিতে অথবা চিত্রের ব্যঞ্জনায় মানব-মনের সূক্ষ্মতম আবেগ এবং অনুভূতিও প্রকাশ্য। তা'হলে প্রশ্ন উঠবে, ভাষা এবং ললিতকলা কি একই পর্যায়ের বস্তু? একটু বিচার করলে দেখতে পাব, মোটেই তা নয়। শিল্পকলা আমাদের মানস-জগতের প্রতিচ্ছবি একথা ঠিক, কিন্তু দু'জন লোকের মনের ভাব আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে জীবন্ত মাধ্যমের কাজ করা এগুলির পক্ষে অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিক প্রয়োজন থেকে উদ্ভব হলেও শিল্পকলা মূলত কৃত্রিম এবং ভাষা মৌলিক বস্তু। তার মানে, ক্রমবিবর্তনের ধারায় সৌন্দর্যবোধটা যেমন আমাদের আনুষঙ্গিক অর্জন, তেমনি শিল্পসৃষ্টিও জীবনের আনুষঙ্গিক পরিচয় মাত্র। জীবনের মহত্তর বিকাশ ও বৈচিত্র্যের জন্য এ আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু এ নাহলেও আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না। কিন্তু ভাষার বেলায় এমন কথা বলা অসম্ভব। কারণ, সমাজে একটি কি দু'টি বোবা থাকতে পারে, কিন্তু বোবার সমাজ অকল্পনীয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো ভাষাও আমাদের জীবন-ধারণের জন্য অপরিহার্য। এই জন্যই পাশ্চাত্যের ভাষাতাত্ত্বিকগণ ভাষাবিজ্ঞানকে প্রাকৃত-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জীবনকে কেন্দ্র করে যেমন জীববিজ্ঞান, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে যেমন ভূ-বিজ্ঞান, তেমনি ভাষাকে কেন্দ্র করে ভাষা-বিজ্ঞান।

ভাষার বিচার-পদ্ধতি এবং সম্ভাবনার ক্ষেত্রও অন্যান্য বিজ্ঞানেরই অনুরূপ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যেতে পারে, জীববিজ্ঞানের কাজ হল সকল প্রকার জীব এবং উদ্ভিদের গঠন-প্রকৃতি, আকৃতি, বিকাশ ও তাদের শ্রেণী রূপের আলোচনা; আর পৃথিবীর গঠন ও তার ইতিহাস, তার উপাদান এবং সে সবের পরস্পর সম্পর্ক ও তার বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী ক্রমবিবর্তনের বিচার ভূ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। ভাষার বেলাও তাই। উদ্ভিদের মতো ভাষারও একটা নিজস্ব জীবন আছে; সে জন্ম নিয়েছে, তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধক্য এসেছে পর্যায়ক্রমে, তারপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়েছে তার মৃত্যুও। কিন্তু সে-মৃত্যু একেবারেই মৃত্যু নয়। বৃক্ষ তার অফুরন্ত প্রাণ-প্রবাহ যেমন রেখে যায় ফলের

মাটিতে, যা একদিন ফুলে-ফলে ডালপালায় সবুজ পাতার সমারোহ ছড়িয়ে দেয় ঐশ্বর্য, তেমনি কোনো মানব-গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী বেঁচে থাকলে ভাষারও বেগবান বিস্তৃতি ঘটা অবশ্যম্ভাবী। আর এই বিকাশ মোটেই এলোমেলো নয়। জীবের মতো ভাষারও আছে কংকাল, রক্তমাংস, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এবং আত্মা; আবার এসবের বিবর্তনের ধারাও বর্তমান। কাজেই প্রাকৃতবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো এই সবের বিচার বিশ্লেষণ ভাষাবিজ্ঞানের কাজ।

তা'হলে, ভাষাবিচারের প্রকৃতিটা কি তাই এখন আলোচনা করা যাক। প্রথমত, ভাষার চরম রূপটা ধরা পড়ে বাক্যে এবং তার অন্তর্গত প্রত্যেকটি অংশ পরস্পর সম্পর্কিত; কাজেই এক্ষেত্রে বাক্যবিন্যাসের বিচার অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, বাক্যের নিম্নতম একক হচ্ছে পদ এবং এদের নিজস্ব জীবন-ইতিহাস রয়েছে, অতএব পদ বা শব্দের রূপ-বিশ্লেষণ করতে হবে। তৃতীয়ত, শব্দ কতকগুলি নিয়ন্ত্রিত ধ্বনি ছাড়া কিছুই নয়, সুতরাং ধ্বনির প্রকৃতি-নির্ণয় অবশ্য প্রয়োজন, এবং পরিশেষে কয়েকটি ধ্বনির নিয়ন্ত্রিত রূপ থেকে জন্ম নেয় একটি অর্থ, কাজেই শব্দার্থের বিচারও অবশ্য কর্তব্য। এই চারটি ব্যাপারকে পর্যায়ক্রমে দেখলে ভাষার চারটি স্তর সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে: ধ্বনি, শব্দ, বাক্য এবং অর্থ।

ভাষার এই চারটি স্তরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ভাষা-বিজ্ঞানের চারটি শাখা:

(১) ধ্বনি-বিজ্ঞান (ফনেটিক্স) ও ধ্বনিতত্ত্ব (ফনলোজি); গ্রীক 'ফোন' শব্দের অর্থ 'ধ্বনি'। (২) রূপতত্ত্ব (মর্ফলোজি)। গ্রীক 'মর্ফি' শব্দের অর্থ আকৃতি বা রূপ। (৩) বাক্য-রীতি (সিনট্যাক্স)। এবং (৪) শব্দার্থতত্ত্ব (সিমাসিওলোজি বা সীমান্টিক্স)। গ্রীক 'সীমাসিয়ে' মানে অর্থ।

ভাষা ধ্বনিরই নিয়ন্ত্রিত বিচিত্র বিকাশ। ধ্বনিবিজ্ঞানের কাজ হল, ভাষার অন্তর্ভুক্ত ধ্বনি অথবা ধ্বনিগুচ্ছের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও শ্রেণী-নির্ণয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বাক্‌যন্ত্রের একটি অংশ জিভের অবস্থান অনুসারে বাংলা-ভাষায় আটটি মৌলিক স্বরধ্বনি (Cardinal Vowels) পাওয়া যাচ্ছে: আ, আ,' ই, এ,' ও, ও,' উ। এগুলির মধ্যে এ, ও ধ্বনিদ্বয়ের

উচ্চারণকালে মুখবিবর প্রায় সংবৃত থাকে আর সেজন্যই এগুলিকে বলা হয় অর্ধ-সংবৃত (Half-close) ধ্বনি। এইভাবে এ এবং ও ধ্বনির যে স্বরূপনির্ণয় তা হচ্ছে ধ্বনিবিজ্ঞানের কাজ। ধ্বনিবিজ্ঞানের বিশ্লিষ্ট বর্ণনাকে যখন গাণিতিক সংকেতে আবদ্ধ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় ধ্বনিতত্ত্ব। বর্ণনার বিস্তৃত রূপকে তত্ত্বের সংক্ষিপ্ততার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করাই ধ্বনিতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এ জগতের নানা পদার্থের স্বভাব, গতি, শক্তি ও গুণ নানা সংকেতে ধরা হয়ে থাকে; যেমন অংকশাস্ত্রে ১, ২, অথবা √ (বর্গমূল), (˙) (দশমিকবিন্দু), + − × ইত্যাদি চিহ্নগুলোর মাধ্যমে অনেক কিছু বোঝান হয়। ভাষাবিজ্ঞানের যে বিভাগে এভাবে জ্যামিতিক, গাণিতিক ও সাংকেতিক উপায়ে ভাষান্তরের সংহতি (Synthesis) দেখানো হয় তাকে ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) বলা হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানে যাকে নানা কথায় বিশ্লেষণ করা হয়, ধ্বনিতত্ত্বে তাই হয় সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত কতকগুলো সংকেত বা সূত্রের (Formula) সমষ্টি।

'বক' শব্দটিকে ধরা যাক। প্রথম দৃষ্টিতে দেখা যায় এতে একটা ব্যঞ্জনধ্বনি (c), একটা স্বরধ্বনি (v) এবং অপর একটি ব্যঞ্জনধ্বনি (c) আছে। একে সংক্ষিপ্ত আকারে cvc এই সংকেতে প্রকাশ করা যায়। বিশ্লেষণের বিস্তারিত রূপকে এভাবে সাংকেতিকতার সংক্ষিপ্ততায় প্রকাশ করাই ধ্বনিতত্ত্ব। আপাতত এটা সহজ ব্যাপারকে জটিল করা মনে হলেও ভাষায় গভীর ও ব্যাপক আলোচনায় এর প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয়ত, রূপতত্ত্বের কাজ পদ বা শব্দের গঠন-প্রকৃতির বিচার। বিশেষ করে, শব্দের অবক্ষয় কিংবা শব্দমূলের মধ্যে যে পরিবর্তন, তার আলোচনা এর অঙ্গ। এমন ভাষাও আছে যাকে বলা যায়, কতকগুলি মৌলিক শব্দের সমষ্টি, শব্দমূলে উপসর্গ প্রত্যয় বিভক্তি-সমূহকে গ্রহণ করার শক্তি তার নেই। মূলত বাইরের অথবা ভিতরের কোনোরকম পরিবর্তনই এর মধ্যে সম্ভব নয়। যেমন চীনাভাষা। চীনাভাষাকে কতকগুলি 'সাজানো শব্দের শৃঙ্খলা' ছাড়া কিছু বলা যায় না। যেমন: 'হোয়াহ্ জিন সীন ডি জিওউনী উইউ শীহ্ লে', এর অর্থ 'তোমাকে শেখাবার জন্য যথাসাধ্য করব।' কিন্তু চীনাভাষায়

শব্দগুলি সাজানো আছে এইভাবে: আমি নিঃশেষ করি হৃদয় শিক্ষা দেওয়া তোমাকে'। আবার 'ফাড রীন চ' রিন্,-এর অর্থ 'তরবারি দিয়ে একটি লোককে হত্যা করা,' কিন্তু চীনাভাষায় সাজানো শব্দগুলির ধারাবাহিক অর্থ হচ্ছে: 'হত্যাকরা লোক লওয়া তরবারি।' এই সবের প্রত্যেকটি শব্দই মৌলিক, কাজেই এদের আকৃতিগত পরিবর্তন হয় না। কিন্তু উচ্চারণের অতি সূক্ষ্ম হেরফেরই এদের বিচিত্র অর্থান্তর ঘটে। যেমন, 'গ'েয়্য গোক্' এর মানে হচ্ছে 'শয়তান দেশ' এবং 'গয়্যে' গোক্' হচ্ছে 'সম্মানিত দেশ'। এখানে উচ্চারণের সামান্য তারতম্যের দরুন শব্দের অর্থে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথম উদাহরণে গয়্যে-র 'এ'র ওপরে টানে হল 'শয়তান' এবং দ্বিতীয় উদাহরণে য়্য-এর ওপরে টানে হল 'সম্মানিত'।

চীনাভাষার শব্দাবলীর সঠিক হিশেব কেউ দিতে পারে নি। কাংসীর বিখ্যাত অভিধানে মোট চল্লিশ হাজার শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, আবার গাইল্সের অভিধানে পাওয়া যায় দশ হাজার আটশ' উনষাট্টি শব্দের বিবৃতি। এগুলি হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ার ফল। কেননা, একেক অঞ্চলের চলতি ভাষায় একেক রকমের ধ্বনি-বৈচিত্র্য রয়েছে, কাজেই সেগুলির প্রত্যকটি গ্রহণ করলেশব্দ-সংখ্যা বাড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণভাবে দেখলে চীনাভাষায় মৌলিক শব্দ চার শতের কিছু ওপরে, এবং মূলত এগুলির ওপরেই গোটা ভাষাটা প্রতিষ্ঠিত।

কোনো কোনো ভাষায় দেখা যায়, শব্দের গঠন-প্রকৃতি যৌগিক। এখানে 'যৌগিক' মানে একটির সঙ্গে অন্যটির 'মিশে যাওয়া' নয়, বরং প্রয়োজনের খাতিরে পরস্পর 'যোগ হওয়া'। কোনো শব্দের মূলভাবটির ধারক যে শব্দমূল, তার মধ্যে উপসর্গ বা প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ত হয়ে সেই মূলগত অর্থের ব্যবহারিক প্রসার ঘটায়, অথবা এগুলি সেই শব্দের সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য শব্দের ব্যাকরণগত সম্বন্ধ নির্দেশ করে। এই সংযোজনযোগ্য ধ্বনিগুলির আলাদাভাবে কোনো অর্থ নেই; কিন্তু শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দার্থের প্রয়োজনীয় পরিবতন সাধনে এরা পুরাপুরি সক্ষম। এইগুলিকে শব্দের সঙ্গে ইচ্ছে-মতো যোগ করা যায়, আবার বিয়োগও করা যায় এবং তাতে শব্দমূলটি মোটেই বিপর্যস্ত হয় না।

যেমন তুর্কি ভাষায়, সেভ মেক—ভালোবাসা (ক্রিয়া), সেভ ইন্ মেক—নিজেকে ভালোবাসা, সেভ ইশ্ মেক—পরস্পর ভালোবাসা, সেভ ডির মেক—ভালোবাসতে বাধ্য করা, সেভ ইল্ মেক—ভালোবাসা পাওয়া, সেভ মে মেক—ভালো না বাসা এবং সেভ ইন্ ডির্ ইল্ মে মেক—নিজেকে ভালোবাসতে বাধ্য না করা। এই উদাহরণে ইন্ ইশ্ ডির্ ইল্ মে এই প্রত্যয়সদৃশ ধ্বনিগুলির আলাদা কোনো অর্থ নেই; কিন্তু সেভ এবং মেক এই দুটি শব্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে এদের বিভিন্ন অবস্থার অর্থ প্রকাশ করেছে এবং তা'তে ঐ দুটি শব্দের মূলগত আকৃতি ও অর্থের কোনো বিপর্যয় হয়নি।

কিন্তু পৃথিবীর বেশির ভাগ ভাষার শব্দই ধাতুভিত্তিক। এদের মধ্যে উপসর্গ ও প্রত্যয়-বিভক্তির সংযোগের প্রকৃতি কতকটা উপরোক্ত উদাহরণের মতোই। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে উপসর্গ ও প্রত্যয়-বিভক্তি মূলধাতুর সঙ্গে এমন গভীর ভাবে মিশে যায়, এবং ধাতুসম্পন্ন শব্দগুলির আকৃতি ও অর্থে এমন বৈচিত্র্য আসে, যাতে ধাতুটিকে তুর্কি শব্দমূলের মতো এত সহজে চেনা যায় না। যেমন বিভিন্ন উপসর্গ-যোগে 'হার্' ধাতুর রূপ: প্রহার (প্র+হার)—পিটুনি দেওয়া; সংহার (সম্+হার্)—মেরে ফেলা; বিহার (বি+হার্) —প্রমোদ-ভ্রমণ; উদ্ধার (উৎ+হার্)—রক্ষা, পুনরধিকার; পরিহার (পরি+হার্)—বর্জন; প্রতিহারী (প্রতি+হার্+ঈ)—দ্বারপাল; উপহার (উপ+হার্) প্রীতির সহিত প্রদেয় বস্তু, উপঢৌকন; আহার (আ+হার্)—খাওয়া। প্রত্যয় যোগে কৃ ধাতুর বিভিন্ন শব্দ: কৃত, করণ, কার্য, কৃত্য, ক্রিয়া, কর্তব্য, করণীয়, কর্ম, কৃত্রিম, কর্তা, কারক, চিকীর্ষা, ক্রিয়মাণ।

রূপতত্ত্বের কাজ হল এইভাবে শব্দের গঠন-প্রকৃতির বিচার ও শ্রেণী-বিভাগ।

তৃতীয়ত, বাক্য-রীতি। এর কাজ হল বাক্য-গঠনের নিয়মকানুনের আলোচনা। আমরা দেখেছি, নিয়ন্ত্রিত ধ্বনির পরিণতি হচ্ছে শব্দ। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এই সকল শব্দ বস্তু, গুণাগুণ অথবা ক্রিয়ার প্রতীকমাত্র। ব্ ঋ ষ্ ট্ ই—এই ধ্বনিগুলির সমন্বয়ে হল একটি শব্দ 'বৃষ্টি' এবং এ বলতে আমরা আকাশের মেঘ থেকে পতনশীল পানির বিন্দুকে বুঝি। আবার

স্‌ উ ন্‌ দ্‌ অ র্‌—এই ধ্বনিগুলির সমন্বয়ে হল 'সুন্দর' একটি গুণের নাম; এবং প্‌ অ ড়্‌ ছ্‌ এ—এগুলির মিলনে হল 'পড়ছে'। এই শব্দগুলির স্বতন্ত্র অর্থ আছে, যা কোনো বস্তু, গুণ অথবা ক্রিয়ার নির্দেশ করে; কিন্তু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এগুলি কোনো মনের ভাবকে ব্যক্ত করতে পারছে না। মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য শব্দসমূহের যে বিন্যাস, তাকেই বলি বাক্য। যেমন কী সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে। কিংবা সবুজ বনানীর ওপরে আবছা সন্ধ্যায় কী সুন্দর পড়ছে বৃষ্টি। আরও উচ্চকিত পর্যায়ে এই বাক্যই হতে পারে নিগূঢ় ব্যঞ্জনার দ্যোতক, যেখানে ভাবটাই শুধু ধরা পড়ে না, বরং স্থান কাল পাত্রও জীবন্ত হয়ে ওঠে। যেমন, রজনী শাঙন ঘন ঘনদেয়া গরজন, রিমিঝিমি শব্দে বরিষে। পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে, নিন্দ যাই মনের হরিষে। এইসব দৃষ্টান্তের শব্দগুলি বাইরে প্রত্যেকটি স্বাধীন ছিল এবং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অর্থ প্রকাশ করত, কিন্তু বাক্যের মধ্যে এসে একদিকে একটা গোটা মনোভাবের প্রকাশ হল, অন্যদিকে এদের মধ্যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হল। কেউ হল কর্তা, কেউ কর্ম, কেউ ক্রিয়া, কেউ বিশেষণ, আবার কেউ বা হল সর্বনাম, অব্যয়। বাক্যের মধ্যে এদের ভূমিকা-নির্ণয় বাক্য-রীতির অন্তর্গত।

চতুর্থত, শব্দার্থতত্ত্বের কাজ হল, শব্দার্থের পরিবর্তন এবং তাদের যে নতুন নতুন অর্থ, তারই বিশ্লেষণ। অবশ্য আদি রূপ থেকে শব্দের অর্থ কেমন করে রূপান্তরিত হয়, শব্দার্থতত্ত্ব তাও দেখে চলে। প্রত্যেক ভাষায় অহরহই শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটছে। দশ বছর আগে একটি শব্দের যে অর্থ ছিল দশ বছর পরে হয়ত হয়েছে তার সম্পূর্ণ অন্য অর্থ। ধ্বনির অবক্ষয় এর একটা কারণ বটে, কিন্তু শুধু তাই নয়। শব্দার্থের পরিবর্তনের পিছনে মানব-মনের গূঢ় রহস্য বর্তমান। একটি শব্দ ঠিক কি জন্য অর্থ পরিবর্তন করল, তার কারণ নির্ণয় সহজ নয়। অবশ্য দেশের ভৌগোলিক, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা করে একটা শব্দের অর্থ পরিবর্তনের জন্য দায়ী বাইরের শক্তি-সমূহের প্রভাবের দিকটা বিচার করা সম্ভব।

অভিধানে নির্দিষ্ট যে শব্দের অর্থ তা অচঞ্চল, স্থির। কিন্তু কথাবার্তার মধ্যে এসে তা আর স্থির থাকতে পারে না। কারণ, এ তখন মানুষের মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন অভিধানের যে 'হাত' তার একটিই অর্থ—সে হল, শরীরের অঙ্গবিশেষ। কিন্তু মানুষের কথাবার্তার মধ্যে এসে

তার অন্তত উনত্রিশ রকম অর্থ হতে পারে। উপরন্তু, কথাবার্তার সময় বিশেষ বিশেষ টান ও উচ্চারণভঙ্গির দরুন একই শব্দ যে বিচিত্র মনোভাবের প্রকাশক হয়, তার উদাহরণ মোটেই বিরল নয়। এইভাবে স্থান, সময় বা অবস্থার বিশেষ বিশেষ প্রেক্ষিতে ভাষার যে সচল জীবন্ত রূপ, তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে ভাষা-বিচারের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে, সে হল 'বিহেবিয়ারিস্ট্' মতবাদ।

স্বাভাবিকভাবে অর্থের যে পরিবর্তন তা তিন প্রকৃতির। প্রথমত, অর্থের বিস্তার। যেমন, সংস্কৃত 'গঙ্গা' মানে 'গঙ্গানদী'--কিন্তু এর থেকে উৎপন্ন 'গাঙ' শব্দের অর্থ 'যে-কোন নদী'। সংস্কৃত 'উত্তীর্ণ' মানে 'নদী পার হওয়া'; কিন্তু বাংলায় এর অর্থ হল 'সফল হওয়া'। দ্বিতীয়ত অথের সংকোচন। যেমন, সংস্কৃত 'মৃগ' মানে ছিল 'পশুপক্ষী'। কিন্তু বর্তমানে এর অর্থ 'হরিণ'। তৃতীয়ত, অর্থের পরিবর্তন। যেমন, সংস্কৃত 'ঘর্ম' শব্দের অর্থ ছিল 'গরম' কিন্তু বাংলায় এর অর্থ হয়েছে 'ঘাম'।

এইভাবে ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্য-রীতি এবং শব্দার্থতত্ত্ব—এই চারিটি বিভাগে যে ভাষার বিচার, তার প্রকৃতিও আবার তিনরকম হতে পারে: ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক এবং তুলনামূলক। ভাষার ঐতিহাসিক বিচারে থাকে তার কালগত ধারাবাহিক রূপান্তরের আলোচনা। বণনামূলক বিচারে কোনো ভাষার কোনো নির্দিষ্ট অবস্থার বা সময়ের রূপ বিশ্লেষণ ও গঠন-প্রকৃতির আলোচনা এবং তুলনামূলক বিচারে সমগোষ্ঠীর সমান অবস্থার অন্যান্য সকল ভাষার সঙ্গে সে ভাষার সম্বন্ধ নির্ণয়।

পরিশেষে, আর একটি ব্যাপার আলোচনা করব। ইংরেজীতে ভাষাবিজ্ঞানকে বলা হত 'কম্প্যারেটিভ ফিলোলজি'। সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই তুলনামূলক, সে হিশেবে ভাষাবিজ্ঞানের বেলায় বিশেষভাবে এই প্রকৃতিটার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার কোনো অর্থ নেই। কিন্তু তবু তা করা হয়েছে, হয়তো এদিকটার প্রতি একটু বেশী জোর দেবার জন্যই।

ভাষা-বিচার তুলনামূলক একথা অবশ্যই ঠিক। একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে এই সঙ্গে তার আরও একটি প্রকৃতি ধরা পড়বে, সেহল ভাষাবিচার আপেক্ষিকও (Relative) বটে। ফরাসী, ইংরেজ ও জার্মান ভাষাতাত্ত্বিকগণ ভাষার এই প্রকৃতিটার প্রতি ততটা গুরুত্ব আরোপ করেননি। তাঁরা মূলত একভাবে শুধু ভাষারই বিচার করেছেন।

কিন্তু আমরা দেখেছি, ভাষারও জীবন আছে এবং তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মানুষের জীবনের ওপর। আর সে মানুষ কোনো স্থবির পদার্থ নয়। সে নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রাণী, বাইরের বস্তুজগতকে রূপান্তর ও নিয়ন্ত্রণ করছে। বস্তুজগতের সংস্পর্শে প্রতিনিয়তই তার মনে যে সকল অনুভূতি, চিন্তা ও ইচ্ছার উদয় হচ্ছে, তার কিছুটা বাক্‌যন্ত্রের মাধ্যমে ভাষা-রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। কাজেই, একদিকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবে তার বাক্‌যন্ত্রের সূক্ষ্মতম পরিবর্তন, এবং অন্যদিকে নিয়ত পরিবর্তনশীল বস্তুজগতের প্রভাবে তার মনের ভাব-বৈচিত্র্য—এই দু'টি শক্তি মৌখিক ভাষাকে প্রতি মুহূর্তে নতুনত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এইভাবে, মানুষের সমাজিক জীবনাচরণ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশপদ্ধতি এবং জীবনাচরণের সকল অনুক্রমে প্রাথমিক মানসক্রিয়া সমূহের—অর্থাৎ অনুভব, চিন্তা ও ইচ্ছার মধ্যে ভাষা প্রধানতম সাধনশক্তিরূপে কার্যকরী রয়েছে বলেই উভয়ের ঐতিহাসিক বিকাশপদ্ধতিও অভিন্ন।

অতএব, বলা যায়, ভাষার জীবন সমাজের সঙ্গে আপেক্ষিক। কোনো মানব-গোষ্ঠীর উচ্চারিত ভাষার রহস্যকে আমরা পুরাপুরি কিছুতেই বুঝতে পারব না, যদি না তাদের সংগঠিত সমাজের সামগ্রিক ঐতিহাসিক বিচার করি। মূলত, ভাষা-বিচার ও সমাজ-বিচার অবিচ্ছেদ্য।

১৯৫৬

ভাষার উৎপত্তি ও প্রাথমিক বিকাশ

ভাষার ইতিহাস বিশাল এবং বিচিত্র। আজকের দুনিয়ার মানুষের বহুমুখী রূপের দিকে তাকিয়ে আমরা যেমন ভাবতে পারি না, কয়েক লক্ষ বছর আগে মানুষের গুটিকতক পূর্বপুরুষ ভারত মহাসাগরের কোনো দ্বীপে তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিল, তেমনি আজকের দুনিয়ার ভাষা দেখেও আমরা বুঝতে পারি না তার জন্ম ও শৈশবের হাঁটি হাঁটি পায়-পায়-এর ইতিবৃত্ত। ভাষা আমাদের জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক। কাজেই এর রহস্যের কথা ভেবে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হই না। অথচ এর বিকাশ-কাহিনী, সত্যিই বিস্ময়কর।

ভাষার উৎপত্তি নির্দেশ করতে গেলে অতীত-ইতিহাসের তমসালোকে পথহারানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমনকি পৃথিবীর আদিগ্রন্থ বলে পরিচিত পেপিরাসে লেখা মিশরদেশের 'তাহোতেপের উপদেশাবলী' (রচনাকাল আনুমানিক ৩৮০০—২৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) এবং 'মৃতদিগের গ্রন্থ'ও (এর বিভিন্ন অধ্যায়ের রচনাকাল আনুমানিক ৪২৬৬—২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) এইদিক থেকে অর্বাচীন ও অসহায়। এজন্যই কবি-ভাষ্যকারের মুখ থেকে শুনতে পাই: 'তারা কোন যাযাবার মানুষ যারা অজানা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রায় দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের পথিক ছিল, যারা এই ভাষার প্রথম কম্পমান অস্পষ্ট শিখার প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল অখ্যাত জন্মভূমি থেকে সুদীর্ঘ বন্ধুর বাধাজটিল পথে। সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে অন্য এক যুগের বাত্তির মুখে জ্বলতে জ্বলতে আমার এই কলমের আগায় আপন আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল।'

বাস্তবিক, ভাষার উৎপত্তি কখন হয়েছিল তার সন, তারিখ নির্ধারণ করা অসম্ভব। কিন্তু পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মারফতে মানুষের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, সেই আলোকে জীব হিশেবে তার ক্রমবিকাশের কোন

স্তরে অর্বাচীন ধ্বনি-সমষ্টির উৎপত্তি সম্ভবপর, সে সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞানের অনুমান পদ্ধতির দ্বারা আমরা কতকটা যথাযথ ধারণাই গড়ে তুলতে পারি।

এক হিশেবে মানুষ প্রকৃতিরই অভিব্যক্তি। কিন্তু এখন তার স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। প্রথম থেকেই তার জীবনে প্রকৃতির দ্বৈত ভমিকা দেখতে পাই, একদিকে তা' বন্ধু অন্যদিকে শত্রুও। বন্ধু এইজন্য যে, সে এক প্রাচুর্যের ভাণ্ডার এবং শত্রু এইজন্য যে, সে সংহারক। একদিকে সে দেয় আশ্রয় ও খাদ্য, অনাদিকে হিংস্র জীবজন্তু ও তুষার বৃষ্টি ঝড় লেলিয়ে দিয়ে মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। কাজেই, জীবনধারণের আহার্য আহরণের জন্য যেমন, তেমনি আত্মরক্ষার জন্যও মানুষকে প্রথমেই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে রত হতে হয়েছিল। আর এই-ভাবে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও প্রয়াসের দ্বারা প্রকৃতিকে নানাভাবে জয় এবং নিয়ন্ত্রণ করেই তার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবে মানুষের দৈহিক বিকাশ হয়েছে এবং অন্যদিকে তার দৈহিক বিকাশের প্রভাবে তার প্রয়াস-পদ্ধতিরও গুণগত রূপান্তর ঘটেছে। এই প্রয়াসেরই অন্য নাম, শ্রম। অনাদিকাল থেকে এই শ্রমই মানুষের জীবনের কেন্দ্রীয় শক্তি হিশেবে কাজ করে আসছে।

শ্রম শরীরের ভারবহনের দায়িত্ব থেকে হাতের মুক্তির জন্য দায়ী, সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে তার মস্তিষ্কের উন্নতির জন্যও এবং এগুলির ক্রিয়াশীলতার ফলেই মানবজাতির বিস্ময়কর বিকাশ।

ভাষার উৎপত্তির প্রশ্নটাকে ইতিহাসের এই ধারায় ফেলে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই, জীবনধারণের জন্য যেদিন প্রথম একজন মানুষ অন্য আর একজনের সাহায্য-লাভের চেষ্টা করল সেদিনই এবং সে চেষ্টাতেই সমাজের সম্ভাবনা সূচিত হল, সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও। আর অঙ্গভঙ্গি এবং স্বরধ্বনিই তার প্রারম্ভিক পর্যায়।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, তা হল এই যে, মানুষের বাক্‌যন্ত্র তখনো প্রকাশক্ষম হয়ে ওঠেনি। সেজন্য নতুন নতুনবস্তুর অভিজ্ঞতা তার মস্তিষ্ক ও মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তাকে উপরোক্ত দু'টি প্রক্রিয়ায় প্রকাশ করা ছাড়া তার উপায় ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পুরনো প্রস্তর যুগের বনচারী কোনো মানব-যূথের মধ্য থেকে অগ্রগামী একটি যুবক হয়তো একটি নতুন ফলের

সন্ধান পেল। সেটি আহারযোগ্য কিনা তা পরে বিবেচ্য, আপাততে তাকে আহরণ করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল গাছটি মারাত্মক কাঁটা-লতায় ঘেরা। ছেলেটি ভাবল কিছুক্ষণ, এরপর পিছনে-পড়া দলটিকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিল। এই যে ডাক (ও-ও-ও-ও) তা প্রত্নতাত্ত্বিক স্বরধ্বনি, যুক্তিবিজ্ঞানের অনুমতি দ্বারা তা নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যেতে পারে। এখন, ডাক শুনে দলের অন্যান্য নারীপুরুষ দ্রুতপদে ছুটে এসে ব্যাপারটা সবাই মিলে পর্যবেক্ষণ করল। কারণ, একা কারুর পক্ষে সে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিল না। তাই প্রয়োজন হল আলোচনার। এবং পরস্পরের মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্য এই যে কথাবার্তা, তা বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গির সঙ্গে কতকগুলি সহজ-সম্ভব ধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘ, লম্বিত-ভগ্ন উচ্চারণ ছাড়া কিছু নয়। এইভাবে ভাষার প্রাথমিক স্তরেই স্বরধ্বনি-সমূহের (Vowel Sounds) সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য এই ধ্বনিগুলি যে তখনো বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল এবং অ আ ই উ এ ও প্রভৃতি কয়েকটি নির্দিষ্ট স্বর-ধ্বনিতে নিয়ন্ত্রিত হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। জীবনাচরণের ক্ষেত্রে অনুরূপ আরও শত প্রকার সহযোগিতার মধ্য থেকেই ভাষার প্রাথমিক বিকাশ।

বস্তুর বর্তমান রূপ বিশ্লেষণ করলে তার অতীতের অনেক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব। সে হিশেবে ভাষার সাম্প্রতিক রূপ বিচার করে তার জন্ম এবং শৈশবের অনেক কাহিনী জানতে পারব। আমরা দেখতে পাই, বর্তমানেও অঙ্গভঙ্গি সব ভাষারই অঙ্গীভূত। চোখের বিশেষ দৃষ্টি, ঠোঁটের আকুঞ্চন-প্রসারণ, হাত ও আঙুলের সঞ্চালন কথা বলার সঙ্গে যুক্ত না হলে অনেক অবস্থায়ই মনের ভাব পুরাপুরি ব্যক্ত হয় না। চোখের বিশেষ দৃষ্টি কিংবা শুধু একটি আঙুলের ইশারায় একটি লোককে ডাকলাম, এই হচ্ছে ভাষার নিম্নতম পরিচয়। দ্বিতীয়ত, মনের সংক্ষিপ্ততম ভাব অথবা অনুভূতিকে আজকের দিনেও আমরা বিভিন্ন স্বরধ্বনির ভঙ্গি দিয়েই প্রকাশ করি। যেমন, ইটের কোণায় হোঁচট লেগে পায়ের একটি আঙুল থেৎলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলাম, 'উহ্'। এই একটিমাত্র ধ্বনি দিয়ে আঘাতের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করলাম। মাতৃগর্ভ থেকে পড়বার পর শিশুর যে 'উঁআ' 'উঁআ' কান্না ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে তা মোটেই নিরর্থক নয়। কেননা এইগুলিতে রয়েছে ভাষার আদিমতম স্মৃতির নিদর্শন।

ইউরোপের একশ্রেণীর ভাষাতাত্ত্বিকের মতে প্রকৃতি এবং মানবেতর নানা জীবজন্তুর ধ্বনিসমূহ নকল করে মানুষ প্রথম ভাষা উচ্চারণ করতে শিখেছিল। এই মতবাদ বিচারসাপেক্ষ। একথা অবশ্য ঠিক যে, তখন মানুষের চারপাশে ছিল প্রকৃতি ও পশুপক্ষীর রাজত্ব। হাওয়ার হি-হি ঝড়ের শোঁ শোঁ, সা-সা শন শন, বৃষ্টির ঝিরঝির ঝম্‌ঝম্, বজ্র ফেটে যাওয়ার ক্রাক্ ক্রাক্, ঝর্ণার ঝর্‌ঝর—প্রভৃতি ধ্বনির অভিজ্ঞতা মানুষের পক্ষে প্রাথমিক। দ্বিতীয়ত, পাখির কিচ্‌কিচ্ ফিসফিস হিস্‌হিস্ এবং পশুর ঘেউ-ঘেউ ভেউ-ভেউ, ভ্যা-ভ্যা কা-কা শব্দ প্রতিনিয়তই মানুষের কানে বেজেছে। পাখির মধুর কাকলি শুনে সে হয়তো মুগ্ধও হয়েছে অনেক সময়। কিন্তু তবু এইসব প্রমাণ থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মানুষ প্রথমে বোবা ছিল এবং প্রকৃতি ও পশুপক্ষীর শব্দ শুনতে শুনতে সে ধ্বনি উচ্চারণ করতে শিখেছে।

প্রকৃতি ও পশুপক্ষীর ধ্বনি এবং মানুষের উচ্চারিত ধ্বনির মধ্যে সবশেষ পর্যায়ে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না, এ কথা ঠিকই। কিন্তু তবু এ-দুই এক নয়। গতিশীল প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার ধ্বনিসমূহ তার সজ্ঞান কোনো মনোভাবের প্রকাশ নয়, তা'ছাড়া সেইসব ধ্বনি এমনি অজস্র যে, সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব। পশু-পক্ষীর ধ্বনি সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যেতে পারে। ভেড়ার ডাককে কেউ বলে 'ব্যা'—আবার কেউ বলে 'ম্যা'। মানুষের ব্ অথবা ম্ ধ্বনি তার প্রতিবিম্ব নয়। রোমান কবি ব্যাঙের ডাককে বলেছেন 'সাব এ্যাকোয়া' আর গ্রীক নাট্যকার বলেছেন, 'কো-আশ্'। এদিকে আমরা বলি 'ম্যাক' অথবা 'ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর'।

কাজেই উপরোক্ত মতবাদকেই যথার্থ বলে মেনে নেয়া যায়না। মূলত মানুষের উচ্চারিত ধ্বনিসমূহ স্বভাবজ। মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই 'উঁআ' 'উঁআ' করে ওঠে; প্রকৃতির কোনো শব্দ অথবা পশু-পক্ষীর আওয়াজ শোনবার অপেক্ষা সে করে না। মানুষের দেহটাই এমনভাবে তৈরী যে, তার ভাষা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কৃতকর্মের অন্যতম পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখের কাজ দেখা, কানের কাজ শোনা, নাকের কাজ শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা ও ঘ্রাণ লওয়া, ত্বকের কাজ শরীরের আচ্ছাদন ও স্পর্শ অনুভব করা। তেমনি বাক্‌যন্ত্রের কাজ ধ্বনি উচ্চারণ করা।

অবশ্য প্রথম অবস্থায় মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ও মন্থর ছিল। আহার, নিদ্রা এবং মৈথন—এই তিন কোটিতেই ছিল তার ভাগ্য বাঁধা। এই তিনটি ব্যাপার আধুনিক মানুষেরও মৌলিক প্রয়োজন, কিন্তু নিবৃত্তির উপায়ের কথা ভাবলে আজকের সঙ্গে সেদিনের কোনো তুলনাই হয় না। তখন আহার্য যেমন ছিল অপ্রচুর, তেমনি আহার্য সংগ্রহের যে প্রয়াস তাও ছিল বৈচিত্র্যহীন। তার ওপর পাথরের অমসৃণ হাতিয়ার তার সম্বল; বনে-জঙ্গলে ঘুরে ফলমূল আহরণ করা এবং সবাই মিলে তা ভক্ষণ করা। অন্যদিকে পাহাড়ের গুহায় শুয়ে তার যে নিদ্রা তা ক্লান্তি হরণ করেছে এবং পরের দিনের শ্রমের উপযুক্ত করেছে শরীরকে। আর যৌন-মিলন তার বংশধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এইভাবে জীবন-ধারণের অপ্রতুল উপকরণ, তার অনুভব, চিন্তা ও ইচ্ছার মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য আনতে পারেনি। কাজেই তার ভাষার রূপটা অঙ্গভঙ্গি এবং স্বরধনির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

সমাজ-বিজ্ঞানিগণ মানব-সমাজকে তিনটি যুগে ভাগ করেছেন: বন্য, বর্বর ও সভ্য। নেঅণ্ডর্থল গ্রিমালদি, ক্রোমেগণ প্রভৃতি মানব সম্প্রদায় ছিল বন্যযুগের অধিবাসী। ভাষার প্রথম স্তরটা এদের সময়েই শেষ হয়েছিল বলা যেতে পারে। এই যুগের অন্তিম পর্যায়ে কাঠ, পাথর ও হাড়ের অস্ত্রশস্ত্র এবং শীত নিবারণের জন্য গাছের ছালের সঙ্গে চামড়ার পোশাকেও সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের খাদ্য ছিল ফলমূল ও কাঁচা মাংস। তখন কোনো শ্রেণীভেদ ছিল না এবং সমাজে মাতৃ-কর্তৃত্ব প্রচলিত ছিল।

এই যুগের শেষ অধ্যায়ে ধীরে ধীরে ব্যঞ্জন-ধ্বনির জন্ম হচ্ছিল, এ অনুমান মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ব্যঞ্জন-ধ্বনির উৎপত্তির কারণ দুটি—(ক) স্বরধ্বনির ক্লান্তিজনিত বিভঙ্গ এবং (খ) বস্তুনিচয়ের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশের চেষ্টা।

প্রথম কারণটার ভিত্তি বাক্‌যন্ত্র। যে-ধ্বনির উচ্চারণকালে নিঃশ্বাস বায়ু মুখের মধ্যে কোথাও কোনরূপ বাধা পায় না, তাকে বলি স্বরধ্বনি। জিভের ও ঠোঁটের সঙ্কুচন-প্রসারণে মুখ-গহ্বরের আয়তনের পরিবর্তন হয় এবং তারই ওপর নির্ভর করে স্বরধ্বনির প্রকারভেদ। অপরপক্ষে মুখবিবরের যে-কোনো স্থানে কোনরকম বাধার সৃষ্টি হলে, যে ধ্বনির উদ্ভব হয় তারই নাম ব্যঞ্জন-ধ্বনি। বাধার স্থানের ও প্রকৃতির ওপর ব্যঞ্জন-

ধ্বনির প্রকারভেদ। কণ্ঠনালীর ঊর্ধ্বভাগ, তালুর পশ্চাৎ, মধ্য ও সম্মুখ ভাগ, দন্তমূল, দন্ত এবং ওষ্ঠদ্বয়—এইগুলিই নিঃশ্বাসবায়ুর বাধার স্থান।

স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জন-ধ্বনির উদ্ভবের ব্যাপারটা এমনি সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক যে, তা ব্যাখ্যা করে বুঝানো মুশকিল। তবে প্রকৃতিটা নির্ণয় করা যেতে পারে। শুধুমাত্র ক্লান্তির কারণে স্বরধ্বনির বিভঙ্গ সম্ভব নয়, যদি না মানুষের বাক্‌যন্ত্রের (Vocal Chords) মধ্যে এমন স্থানের সৃষ্টি হয় যেখানে বিভঙ্গজনিত স্বরটা অবলম্বিত হতে পারে। কাজেই বলা যায়, জীবনাচরণের নব নব শক্তির প্রভাবে মানুষের বাক্‌যন্ত্র অতি সূক্ষ্মভাবে জটিলতর হচ্ছিল, যাতে করে এক সময়ে এসে তা ব্যাঞ্জন-ধ্বনির উচ্চারণ ক্ষমতা লাভ করল। বায়ুনাড়ীর ঝিল্লীতে এইবার দেখা দিল নবতর গুণ। জিহ্বা এবং মুখবিবরও আগের তুলনায় অনেক সংস্কৃত হল। এতদিন ছিল শুধু 'ধ্বনি', এইবার হল 'বর্ণ'।

বাক্‌যন্ত্রের এই বিকাশের পিছনে বিভিন্ন স্বরধ্বনির ক্লান্তিজনিত বিভঙ্গ একটি শক্তি হিশেবে কাজ করেছে। কিভাবে, তাই বলছি। আ এবং উ দু'টি স্বরধ্বনি। আ ধ্বনিকে একটু টেনে উচ্চারণ করে ক্লান্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে হঠাৎ ছেড়ে দিলে তার রূপ হয় 'আহ্' এবং উ ধ্বনির রূপ 'উহ্', 'উফ্'। এখানে আহ্ উহ্ উফ্-এর শেষ ধ্বনিকণার মধ্যে ব্যঞ্জন-ধ্বনির বীজ নিহিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ বস্তু-নিচয়ের স্বাতন্ত্র্য-নির্ণয়ের চেষ্টা। এর পিছনে রয়েছে প্রয়োজনের তাগিদ ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ। জীবনাচরণের ক্ষেত্রে মানুষ ক্রমেই নতুন নতুন বস্তুর সম্মুখীন হল এবং সেগুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হল তার। কিন্তু অ আ ই উ এ ও ঋ প্রভৃতি স্বরধ্বনি দিয়ে সকল বস্তুকে নির্দেশ করা সম্ভব ছিল না। কাজেই, বিভিন্ন বস্তু ও ক্রিয়াকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করার যে অবিরাম প্রয়াস, তাও ব্যঞ্জন-ধ্বনি সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ।

কিন্তু স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে অহিনকুলের সম্বন্ধ নেই। তাদের স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে মিতালি পাতানো এবং তার পরিণতি পরস্পরের সম্মিলন। ব্যঞ্জন-ধ্বনির সঙ্গে মিলিত না হলে অ আ ই উ এ ও ঋ প্রভৃতি স্বরধ্বনি যেমন নিরুপায়, তেমনি স্বরধ্বনির সঙ্গে হাতে হাত, বুকে বুক, কাঁধে কাঁধ না মিললে ক্ চ্ ট্ ত্ প্ য্ প্রভৃতি ব্যঞ্জন-ধ্বনিরও কোনো অর্থ হয় না।

ইলেকট্রন-প্রোটনের সংযোগে পরমাণু, এবং এই পরমাণু বিশ্বের বস্তুনিচয়ের মৌলিক উপাদান। তেমনি স্বর-ব্যঞ্জনের মিলনে হয় ধাতু এবং এই ধাতু প্রায় সকল ভাষারই শব্দসমূহের মৌলিক ভিত্তি। যেমন, সংস্কৃত মৃ (ম্+ঋ) ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দ : মৃত্যু, মরা, মরণ, মর্ত, মুমূর্ষু, ম্রিয়মাণ, মৃত। অথবা বাচ্ (ব্+আ+চ্) ধাতুর শব্দ : উক্ত, বক্তব্য, বক্তা, বচনীয়, বাচ্য, বচন, উক্তি, বাচ, বিবক্ষা, বাক্য।

এর অর্থ হচ্ছে, মানুষের উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টিতে প্রতীকের দ্যোতনা, অর্থাৎ অর্থবান শব্দের সৃষ্টি। ভাষার কাজ হচ্ছে ধ্বনিগুচ্ছের সাহায্যে বিষয়কে মূর্তিমান করা। বিশেষ বিশেষ ধ্বনিগুচ্ছ বিশেষ বিশেষ বস্তু ক্রিয়া অথবা গুণের প্রতীক। যেমন 'লাঙ্গল' বলতে আমরা ল্+আ+ঙ্+গ্+অ+ল্ এই ধ্বনিগুচ্ছকে বুঝি না, বুঝি এদের দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ষণযন্ত্রকে। ভাষার স্বরূপ এই প্রতীক দ্যোতনার মধ্যে অনেকটা নিহিত।

বন্য-যুগের অন্তিম অধ্যায়ে ব্যঞ্জন-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রতীক আরোপিত শব্দমালার ক্রমিক জন্ম হচ্ছিল, এ অনুমেয়। কিন্তু সেগুলি তখন মোটেই জটিল আকৃতির ছিল না। ছিল একস্বর (Mono-syllabic) শব্দ। এ যেন আজকালকার শিশুদের প্রাথমিক ভাষা-প্রচেষ্টা, মা-মা, বা-বা, না-না, পা-পা, তা-তা শব্দেরই মতো।

কিন্তু বর্বর-যুগের প্রারম্ভ থেকেই ভাষার ধ্বনিতে সত্যিকারভাবে ব্যাপক প্রতীক-দ্যোতনা শুরু হল। কেননা, এই সময়ে বস্তু-জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হল আগের চাইতে অনেক বিস্তৃত। এই সময়কে বলা যায়, জনসত্তার যুগ। ইন্দো-ইউরোপীয় 'জন' শব্দের অর্থ মানুষ বা মনুষ্যজাতি। কিন্তু এখানে তার অর্থসংকোচ ঘটেছে। এখানে 'জন' বলতে বুঝি এক বংশ উদ্ভূত মানব সম্প্রদায়। এই সময়ের মাতৃসত্তার লোপ হয়ে পিতৃসত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখন জীবনাচরণের উপকরণ যেমন বাড়ল তেমনি প্রয়াসেও এল বৈচিত্র্য এবং গোত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হল। আদিম ও অমসৃণ পাথরের হাতিয়ারের জায়গায় এইবার হল মসৃণ, দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ অস্ত্রপাতির আবির্ভাব। শিকারক্ষেত্র, ঘরবাড়ি, পশু, ঘাসখেত—এ সমস্ত তখন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছিল না—ছিল সংঘের।

এইভাবে বস্তুর সঙ্গে মানুষের পরিচয় যখন ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ হল তখন স্বাভাবিকভাবে তার উচ্চারিত ধ্বনিতে এল অজস্রতা ও বৈচিত্র্য এবং বস্তু, ক্রিয়া ও বিভিন্ন গুণকে নির্দেশ করতে গিয়ে নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি হল। মানুষের শিশুভাষা কৈশোরের দিকে পা বাড়াল; ক্রমে সম্পত্তি, ধর্ম, শাসন, শিল্পবাণিজ্য, বিভিন্ন সমাজিক সম্পর্ক— এই সবের বিকাশ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পাহাড়ী উৎস থেকে জন্ম-নেওয়া কোনো নদীর মতোই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মানুষের ভাষা সামনের দিকে এগিয়ে এল, এবং পরে দাসযুগ ও পুঁজিবাদী যুগের মধ্য দিয়ে বয়ে এসে বর্তমান মহামানবের মহাসমুদ্রে এসে পড়েছে। বর্তমানে ভাষার যে বৈচিত্র্য শক্তি, তার পরিমাণকে ঋগ্বেদের বাক্-দেবতার কথায়ই প্রকাশ করা যায়, 'আমি স্পর্শ করেছি স্বর্গকে। সকল সৃষ্টিকে ধারণ করে আমি বায়ুর মতো নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিই, তার ওপরে স্বর্গ এবং নিচে মর্ত। এমনই আমার শ্রেষ্ঠত্ব।'

১৯৫৬

ভাষার রূপ ও রূপান্তর

আমি এই মুহূর্তে যে ভাষায় লিখছি, আমি জানি, খানিকক্ষণ বাদে আমার গ্রামীণ আত্মীয় এলে তার সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলব, এ তা' থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। তবু তো গদ্য অনেকটা আটপৌরে; তাকে যত নিরাভরণ, স্বচ্ছ, শাণিত ও কাজের করা যায়, ততই ভালো। কিন্তু যখন কবিতা লিখতে বসব, তখন তার হবে অন্যরূপ; সেখানে দেখব তা'কে অবগুণ্ঠনবতী, রহস্যময়ী, চতুরা; সেখানেও সে কথা বলবে, বরং আরো আরো অনেক বেশী করে বলবে, কিন্তু মুখরা হয়ে নয়, বলবে আধো-আলো আধো-ছায়ায় বসে আভাসে, ইঙ্গিতে, ইশারায়। অথচ এর থেকে জেগে উঠবে কখনো নীল আকাশের নীচে আদিগন্ত উত্তাল সমুদ্র সূর্যের আলোয় তুষার-ধবল পর্বতশীর্ষ, কখনো সবুজ শাখায় ছাওয়া নির্জন অরণ্য-নদীর মৃদু কলধ্বনি, খামারে খামারে সোনালি শস্যের শিস আর কখনোবা একলা গানের মধুর রাগিণী। বিচিত্রা, কখনো সে বসন্তের উপবন, আর কখনো বা বৈশাখী মেঘ, বজ্র-গর্ভ। আর এইভাবে যে গরীয়সী, তাকে দেখতে পাই, অনুভব করতে পাই, কিন্তু তবু আমাদের ঘরের দোর হতে, মাটির কাছ হতে তার দূরত্বও নেহাৎ কম নয়।

প্রকৃতপক্ষে কোনো ভাষা কতটা উন্নত, সাধারণত তার সাহিত্যিক ঐশ্বর্যের মান দিয়েই তার বিচার করা আমাদের অভ্যাস, আর এই প্রবণতা যে একেবারে অযথার্থ এমন কথাও বলা যায় না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা, শক্তিমত্তা ও গভীরতার পরিচায়ক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে যে, উন্নত, অনুন্নত, সবল বা দুর্বল, যাই হোক না, মৌখিক ভাষাই সত্যিকারের ভাষা। উদাহরণ দিলে বলা যায়, পাথরের খোয়া ভাঙতে গিয়ে দু'জন শ্রমিকের কথাবার্তা, অথবা কুঁড়েঘরের নিরালায় কিষাণ-কিষাণীর

শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর ভাষা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতজনের বিভিন্ন কথ্যভাষা থাকা সত্ত্বেও এ সর্বত্র ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম ও সাহিত্যের ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল। এই দৃষ্টান্ত থেকে আরও একটি দিক স্পষ্ট হয়, তা হল, বাণিজ্য, রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানামুখী তরঙ্গ যেখানে কেন্দ্রীভূত, সেখানকার চলতি ভাষা কালক্রমে এমন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে, তা অন্যান্য উপভাষাকে আচ্ছন্ন করে সাধুভাষায় উন্নীত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সংস্কৃত ঋগ্বেদের পরবর্তী সময়ে ভারতীয় আর্যদের কথ্যভাষা ছিল এবং তখন ছিল তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বহুমুখী বিকাশের যুগ। দ্বিতীয়ত, লণ্ডনের উপভাষা থেকেই আধুনিক ইংরেজী সাধুভাষার জন্ম। পরিশেষে [আমাদের দেশেও কি দেখতে পাই? দেখতে পাই, কলকাতা ও তার উপকণ্ঠের কথ্যভাষা শক্তিশালী হয়ে অতি দ্রুত বনেদী সাধুভাষার আসন করে নিচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সাধুভাষা কয়েকজন ব্যক্তির মনগড়া কিছুই নয়।

তবে, একথা সত্য যে, সাহিত্যিক ভাষার সম্পদে ব্যক্তির দান অসামান্য। কালজয়ী প্রতিভা সব সময়ই ঐতিহ্যের প্রবাহে অভিষিক্ত, কিন্তু এই সঙ্গে তিনি নতুন ধাবারা সৃষ্টিও করেন; যতটুকু পড়ে-পাওয়া ধন, তার ওপরে তিনি গড়ে তোলেন অপূর্ব প্রাসাদ। এইভাবে তিনি জগৎ ও জীবনের রহস্যই শুধু উদ্‌ঘাটন করেন না, ভাষার নতুন নতুন অলিগলিও আবিষ্কার করেন। ভাষায় যে ব্যক্তির বিশেষ প্রকাশ, তাকে বলা যায় স্টাইল এবং এর গুণেই জন্ম নেয় অনেক নতুন ইডিয়ম, নতুন শব্দ, পুরনো শব্দের নতুন অর্থ, উপমা রূপক অলঙ্কার, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা। এইভাবে ভারতীয় কালিদাস, গ্রীক হোমার, রোমান ভার্জিল, আরব ইমরুল কায়েস, ইরানী ওমর খৈয়াম, ইংরেজ সেক্সপীয়র, জর্মন গ্যেটে, বাঙালী রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিচিত্র গাথারচনার সঙ্গে নিজ নিজ ভাষাকেও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন।

এই কারণেই, মৌখিক ভাষার ওপর লেখ্য ভাষার সম্মোহন মোটেই অবহেল্য নয়। সাহিত্য কেবল মানুষের আবেগ ও চিন্তাধারাকেই উদ্দীপ্ত করে না, অনেক সময় তার চলিত ভাষাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। বিশেষ করে যে দেশে অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত এবং সাহিত্য আগ্রহের সামগ্রী, সেখানে এই ফলশ্রুতি হাওয়ার চলাচলের মতোই নিশ্চিত। ককনি কোনদিন মরবে না, কিন্তু লণ্ডনের ইংরাজী, যা' ইংরাজী সাহিত্য-ভাষারও

উৎস, তার প্রভাব সারা দুনিয়ার ইংরেজী ভাষাভাষীদের ওপরে নেহাৎ কম নয়। তেমনি, অঞ্চল-নির্বিশেষে সকলের ওপর আধুনিক বাংলা কথ্য-ভাষায় সক্রিয়তা সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যেতে পারে।

অতএব বলতে পারি, মানুষের মতো প্রতিমুহূর্তে ভাষারও নবীভবন অবশ্যম্ভাবী, এবং তার প্রাথমিক রূপ হল, ধ্বনির পরিবর্তন।

কিন্তু, বাক্‌যন্ত্র ছাড়াও, ভাষার গোটা অবয়বের রূপান্তরের পিছনে অন্য কারণও বিদ্যমান। সেগুলিকে বলা যায় বহিরাগত। মানুষ সামাজিক জীব বটে, কিন্তু সমাজের কোনো বিমূর্ত (**Abstract**) রূপ নেই; বেঁচে থাকবার জন্য যে আদি প্রয়োজন তাকে একজোট করেছে তার নাম উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং এটাই হল সমাজের ভিত্তি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যে-সকল লোক ভূমি, যন্ত্রপাতি বা পুঁজির মালিক তারাই হয় সেই বিশেষ সমাজের বা দেশের হর্তাকর্তাবিধাতা। এদিক থেকে পণ্ডিতেরা মানবসমাজকে কতকগুলি যুগে ভাগ করেছেন। কোনো সমাজ যখন যে ব্যবস্থাব অধীন থেকেছে, তার ভাষার মধ্যে তখন সেই প্রতিবেশ-অনুরূপ শব্দাবলীরই সৃষ্টি হয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের পর সামন্তযুগের অবসানের সঙ্গে পুরনো পৃথিবীর সংকীর্ণ দেয়ালই শুধু ভেঙে পড়ল না, নবজাগ্রত বণিক পুঁজির সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মধ্যে জন্মলাভ করল ফলিতবিজ্ঞান। নতুন প্রেরণা, নতুন যাত্রা। নতুন উপনিবেশ, নতুন সাম্রাজ্য। সুতরাং অগ্রসর জাতিগুলির ভাষাও এক প্রচণ্ড আবর্তের সম্মুখীন হল। নানারকম টেকনোলজি এক নিজস্ব শব্দ-বিশ্ব গড়ে তুলল, এবং এই সঙ্গে সাহিত্যের ভাষাতেও এল আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্মতা এবং জটিলতা। বাণিজ্য অথবা শাসনব্যপদেশে ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগের ফলে লিপ্ত দেশের ভাষাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ও স্মরণীয়।

তবে, মনে রাখতে হবে, এই সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ভাষা পল্লবিত ও সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু তার কাঠামোতে আমূল বিপর্যয় আসে না।

আর এখানেই সংস্কৃতির সঙ্গে তাব পার্থক্য। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যেন ভূমি, আর সংস্কৃতি তার পরম ফসল। একটা জাতির সর্বাত্মক জীবনচর্চার মহত্তম পরিচয়ই যদি হয় সংস্কৃতি, তা'হলে সে একান্তই অধিকারী-শ্রেণীর পরিচারিকা কি না সে-সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন তুলতে পারেন; বিশেষত তার মধ্যে

যখন মানব-অভিজ্ঞতার ব্যাপক মিতালি সম্ভব। কিন্তু তবু স্বীকার করা যায় যে, কোনো দেশের সংস্কৃতির নানা তরঙ্গে বিমূর্ত-ব্যঞ্জনার অবকাশ থাকলেও, তার মূলগত প্রকৃতিতে সেই সমাজের তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ অনিবার্য, এবং গভীর। সামন্তসমাজের কালচারের সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজের কালচারের তাই এত ভিন্নতা। এবং এদিক হতে, সমাজতন্ত্রের মধ্যে কালচার যে হবে কতকটা অন্যরূপ, তা'ও স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু ভাষার বেলায় দেখি ভিন্ন ব্যাপার। অর্থনৈতিক বিন্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে একথা ঠিক, কিন্তু ভাষা সংস্কৃতির মতো সমাজের কোনো নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপরিতল (Superstructure) নয়; সেজন্য সংস্কৃতির মধ্যে শ্রেণীচরিত্র যথেষ্টই থাকতে পারে, কিন্তু শ্রেণীভাষা বলে কোনো পদার্থ নেই। ভাষা সমগ্র সমাজের, সর্বশ্রেণীর, যদিও বিভিন্ন স্তরে তার ব্যবহারের মধ্যে নানান বৈচিত্র্য বা বিকৃতি থাকতে পারে। বুনিয়াদের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক যথেষ্ট দূরবর্তী, এমন কি অনেক সময় দুর্নিরীক্ষ, সেজন্য এক্ষেত্রে যে-কোনো রূপান্তর অত্যন্ত মন্থর; কিন্তু ভাষা উৎপাদন-কর্মের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত বলে সর্বস্তরের লোকের আশ্রয়ে তা অতি দ্রুত বেগবতী হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে, গায়ের জোরে ভাষার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনাই সম্ভব নয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই আমার মনে হয়, আমাদের ভাষা-সমস্যার সমাধানে প্রকৃত বিবেচনার পরিচয় দিতে পারব; আর তা নইলে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য অগ্রগামী বাংলার তরুণদের ওপর গুলী-বর্ষণের মতো মূঢ়তা ও দমননীতির অনুবর্তন ভবিষ্যতেও হতে পারে।

১৯৫৭

আমপাতা জামপাতা আন্দোলন

পয়লা বৈশাখে হালখাতা খোলা এদেশের বহু পুরোনো কেতা। কাল অনাদি, সময় পরিবর্তনশীল; কিন্তু মানুষেব জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। আর সেইজন্যই নিজেকে গড়বার, নির্মাণ করে তোলবার তার অফুরন্ত চেষ্টা। নতুন খাতা নতুন কালি, একটু মিষ্টিমুখ, এ কেবল নতুন হিসেবে নয়, জীবনের ক্ষেত্রে নব উদ্যমেরই ইঙ্গিত। আমরা মরি, কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে থাকি অমর হয়ে।

আগামীকাল বছরের প্রথম দিন। মনে পড়ে কিশোরকালে চৈত্রের শেষরাত্রে অনেক ভেবেচিন্তে নোট বইয়ে একটা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখতাম। নতুন বৎসবে সিগারেট খাব না, অমুকের সঙ্গে ঝগড়া করব না, অমুকের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেব, সকাল সাড়ে চারটায় উঠব, রাত বারোটার আগে শুতে যাব না, এমনি সব কঠিন কঠিন শপথ। একপক্ষ কি একমাস ঠিকই চলত, কিন্তু তারপবে আস্তে আস্তে নগ্নীভবন। মাসখানেকের মধ্যেই শামুকের মতো নিজেব খোলসের ভেতরে ফিরে যেতাম।

কিন্তু প্রতিজ্ঞার উত্তেজনাটা ছিল রীতিমতো উপভোগ্য, চেখে চেখে তার স্বাদ নিতাম। যতদিন কানুন মেনে চলতাম, সে কদিন নিজেকে মনে হত অন্য দশজনের চেয়ে অনেক বড় স্বতন্ত্র এবং অসাধারণ।

বলা বাহুল্য, ছোটবেলার আতিশয্য আর নেই। কিন্তু তবু, বলতে বাধা নেই, পয়লা বৈশাখে একটু নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা, একটু খাপছাড়া কল্পনা করার ইচ্ছে হয় বৈকি। আর আজ তো বাইরে মাতাল হাওয়া, শিশুর দেহের মতোই মেদুর কচি আমপাতা দল, এমনি সময়ে ভাবকে বল্গাহারা করে ছেড়ে দিতে কোনো দ্বিধাই আমার নেই।

আমপাতা জামপাতা আন্দোলন কথাটা মনে হতে পারে একটা হেঁয়ালি অথবা আবোল-তাবোল হিংটিংছট। কিন্তু সে আদপেই তা নয়, বরং

তার উল্টো। বাঙলা সাহিত্যে সবুজপত্র আন্দোলন, কল্লোল আন্দোলন, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন যদি এক একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে স্বীকৃত হতে পারে, তবে আমপাতা জামপাতা আন্দোলন কেন ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করবে না সে আমার বোধগম্য নয়। তবে এখানেও কর্মীর দরকার, প্রয়োজন সার্থক শিল্পীর।

আন্দোলন কথাটায় কারো কারো আপত্তি থাকতে পারে। কারণ শিল্প সাহিত্য কি না সূক্ষ্ম জিনিস, এবং ব্যক্তিপ্রতিভার দান। কাব্যনাট্য বাংলা কবিতার নব উত্তরণের একটি দিক হতে পারে কি না সে সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন তা হতে পারে, তবে, জোর করে কিছু করা সম্ভব নয়, এর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া চাই। তাঁর আশঙ্কা বোধ হয় ছিল সজ্ঞান প্রয়াসের কৃত্রিমতার জন্য, এবং তা মোটেই অমূলক নয়। কিন্তু তবু প্রশ্ন করা যায়, ললিতকলার ক্ষেত্রে সচেতন প্রচেষ্টার কি কোনো দাম নেই? সাহিত্যে হোক, চিত্রকলা সঙ্গীতে হোক, দুনিয়ার প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পশ্চাতেই তো রয়েছে এই। কথা হল, প্রচেষ্টার মানে হওয়া চাই সমগ্র শিল্পী-সত্তারই জাগরণ। সেজন্য শিল্পের ক্ষেত্রে আন্দোলন শব্দটার একটু ব্যাপক ও গভীর অর্থ আছে; দৃষ্টিভঙ্গির পরিধিটা সাধারণ হতে পারে, কিন্তু তাও আকাশ আর মাটির মতো, হাওয়ার মতো, একে সবাই মেনে নিলাম, কিন্তু প্রত্যেকেরই পুষ্পবন আর ফসল হবে স্বতন্ত্র। কল্লোলের লেখকেরা নিশ্চয়ই একে অন্যের কার্বনকপি ছিলেন না, বরং প্রত্যেকেই একেকজন জ্যোতিষ্ক, অথচ তাঁরা ছিলেন একই আন্দোলনের অধীন।

পৃথিবীর অনেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাস থেকে এর আরো উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দৃষ্টান্তের বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

একথা মেনে নিতে হয়তো কারো আপত্তি থাকবে না যে, চরম নৈরাজ্যের মধ্য থেকেই হয় আন্দোলন ও বিপ্লবের জন্ম। আসল কথা, জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেই, ইতিহাস অবশ্যই নেবে তার নিজস্ব গতিপথ। আর এরই মধ্য থেকে নানা আলোর ঝর্ণার মতো শিল্প-সাহিত্যে যদি নতুন তরঙ্গ জাগে তা'হলে তাকে স্বাভাবিক প্রকাশ বলে মেনে নিতে বাধা কোথায়? সমাজের মতো আমাদের সাহিত্যেও যে সংকট চলছে, এই আন্দোলন হবে তারই অনিবার্য উত্তরণ। সংকট এজন্য নয় যে,

একদল লেখক ধর্মের গোঁড়ামিতে বিচরণ করেই সন্তুষ্ট, অথবা এজন্যও নয়, তথাকথিত তরুণদের অধিকাংশই কলকাতার দায়ভাগ সিনেমাজগৎ উল্টো-রথ গল্পকাহিনীর অন্ধ নকলনবীশ। শিল্প-সাহিত্যের সাধারণ মূল্যবোধ-গুলোও আমরা হারিয়ে ফেলেছি আর এখানেই ভয়, এখানেই সংকট। পশ্চিম বাংলার কোনো তরুণ লেখকের মধ্যেই প্রেমেন্দ্র বিভূতিভূষণ বুদ্ধদেব মানিক তারাশঙ্করের সমকক্ষ হওয়ার যোগ্য প্রতিভার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, ঘটনাটা করুণ সন্দেহ নেই, কিন্তু সেখানে ছোট বড় প্রত্যেকেই সক্রিয়, প্রত্যেকেই রীতিমত কর্মী। কালোত্তীর্ণ রচনা খুব কমই হচ্ছে; কিন্তু ভালো রচনা অজস্র। কিন্তু আমাদের এখানে একটা কি দুটো লেখা লেখবার পর না লেখাই লেখক হওয়ার কায়দা।

আর এ-ভাবে সাহিত্যের অভাবে, সংস্কৃতির অভাবে আমরা যে কতটা দউলে হয়ে পড়েছি, আমাদের জাতীয় ব্যবহারেই তা সম্যক পরিস্ফুট এবং ভিত্তিহীনতা (rootlessness) আত্মবিলোপেরই নামান্তর।

সেজন্য এই অবস্থাকে আর কিছুতেই চলতে দেওয়া উচিত নয়। এর পরিবর্তন চাই। বরফে জমাট বাঁধা নদীর বুকে প্রাণের তরঙ্গ বইয়ে দিতে হবে।

বড় লেখক যদি এখন না জন্মান দুঃখ করব না; কিন্তু কর্মীলেখক চাই, অনেক অনেক কর্মীলেখক। আগামী মৌসুমের প্রচুর ফসলের জন্য পাহাড় কেটে জঙ্গল সাফ করে জমি তৈরী করার প্রয়োজনীয়তাই এখন সবচেয়ে বেশী। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমপাতা জামপাতা আন্দোলন কথাটার সার্থকতা। কেউ জিজ্ঞেস করবেন এর অর্থ কি? অর্থ নিশ্চয়ই আছে। অর্থ হল, সৎভাবে গভীরভাবে সার্থকভাবে নিজেকে চেনা, নিজের দিকে ফিরে যাওয়া। অর্থ হল, দেশের প্রকৃতি, দেশের মানুষ, দেশের ঐতিহ্য। আমরা যারা কবিতা লিখি গ্রীক মিথোলজি থেকে উপমা থেকে উপমা আমদানী করতে অতি উৎসাহী, আরবী-ফার্সির তো কথাই নেই, কিন্তু দাদিমাদের কিস্সা-কাহিনীর কথা কি আমরা মনে রেখেছি? ইউ-ক্যালিপটাস উইলো পাইন গাছের নাড়িনক্ষত্রের খোঁজ রাখি; কিন্তু আমাদের আমপাতা জামপাতাকে কি চিনেছি? চেয়ে কি দেখেছি এরা কত সুন্দর। কি সোঁদাল গন্ধ এদের কচি শরীর জুড়ে? আমরা যারা গল্প লিখি, আমাদের চরিত্রগুলোকে লরেন্স হেমিংওয়ে ফ্রাঁসোয়া সাগার নায়ক নায়িকা করে

ছেড়ে দিই; কিন্তু আমার ঘরের পাশের কৃষ্ণকলি চাষীর মেয়ের চিত্র কি আমি আঁকতে চেয়েছি? বিশাল বিচিত্র জনপদ থেকে নির্বাসিত আমরা মগজের কারবারী বুদ্ধিজীবী মাত্র। আমরা যারা নাটক লিখি, আর্থার মিলার টেনেসি উইলিয়ামস জন অসবর্ণ-এর নাম বলতে অজ্ঞান; কিন্তু কোনদিন নিজের জীবনের নাট্যলীলাকেও চোখ দিয়ে দেখিনি। আমরা যারা ছবি আঁকি সিজান পিকাসো ডালি আমাদের গুরু; নিজের ঘরের কাথাকে চিনি না, মাটির ঘোড়ার বিমূর্ত কল্পনাকে জানি না। সঙ্গীতের সুর সংযোজনেও দেশের অতুলনীয় সম্পদকে দু'হাতে ঠেলে বিদেশী রেডিওর গান আর রেকর্ডেরই আমরা অনুসারী। কাজেই আমাদের রচনায় আগুন নেই, নেই অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির আরক্তিম গান, যা নতুন প্রাণের সৃষ্টি করতে পারে। বিদেশী কেতায় পোশাক পরে আমরা সভ্য হয়েছি; কিন্তু দুঃখিনী দেশমাতার ধূলিমাটির স্পশ গায়ে লাগছে না বলে, লোমকূপগুলো খোলা সূর্যের আলো আকণ্ঠ পান করতে পারছে না বলে, পানির আদর ও হাওয়ার সোহাগ থেকে বঞ্চিত বলে আমরা যে বাড়তে পারছি না—সে খেয়াল নেই। আমি কেমন করে বাড়ব, কেমন করে শিল্পী হব যদি না মানুষের গায়ের উত্তাপ নিজের গায়ে সঞ্চারিত করে নিতে পারি?

সেজন্য আমপাতা জামপাতা আন্দোলনের মূলমন্ত্রই হচ্ছে মানবতা, মুক্তি এবং সৃষ্টি। মানুষ যাকে আমি চিনি, এবং যার পরিচয়েই দেশ, সুখে দুঃখে সংগ্রামে যে প্রাণপণে টিকে আছে চারদিকে অজস্র শিকড় চালিয়ে সেই আমার শিল্প, এবং তারই জন্য শিল্প। দেশের শিরায় শিরায় আমাকে ডুব দিতে হবে, হতে হবে মাঝি মাল্লা চাষী মজুরের একজন। যে হাত আজ লাঙল ঠেলছে, কলের চাকা ঘোরাচ্ছে সেই একদিন নতুন সভ্যতার নির্মাতা হবে না কি? এবং এখানেই রয়েছে মুক্তির কামনা। মুক্তি, মুক্তি। আমাদের এই পতিত মানবতার মুক্তি চাই। যে শিল্পী যেভাবে কথাটাকে বোঝেন, তিনি সেভাবেই তার রূপ দিন। কোনো গল্পে যদি দেখি, একদিন ট্রেনে চড়ে বাড়ি যাওয়ার পর জমি চষতে গিয়ে কৃষক উপলব্ধি করছে, তার লাঙলটা অত্যন্ত সেকেলে, মোটেই চলছে না-তখন এটাও এক মুক্তির অনুভূতি। তারপর সৃষ্টি এবং সে বর্তমান ভবিষ্যতে প্রসারিত। লড়াই করে, মেহনত করে নতুন সমাজ গড়ে তোলাও সৃষ্টি এবং তার উৎসরণ চারুকলাও

সৃষ্টি। দুয়ের সমন্বয়েই সার্থকতা। মানবতা আমার বিষয়, মুক্তি বিষয়ের আত্মা এবং সৃষ্টি হচ্ছে জীবনসমিদ্ধ সামগ্রিক শিল্পকর্ম।

দুই

আচ্ছা, ধুলিমাটির কাছে যাও, মানুষের দেহের উত্তাপকে নিজের দেহে সঞ্চারিত করে নাও, মেকী সোনা হতে চেয়ো না, যতটুকু পার হও খাঁটি—একথার অর্থ কি স্থূলত্বকে স্বীকার করে নেয়া? গ্রাম্যতার দিকে ফিরে যাওয়া? ব্যাপারটা যে মোটেই তা নয়, আশা করি, সে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। উপন্যাস ছেড়ে কিস্সা-কাহিনী, কবিতা ছেড়ে দোভাষী পুঁথি, ছবি আঁকা ছেড়ে পটলেখার কথা বলা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়।

অপরপক্ষে ব্যাপারটা এও নয় যে, বিদেশী শিল্প-সাহিত্য থেকে আমরা কোনো জিনিসই গ্রহণ করব না। বরং আমরা বড় কিছু, মহৎ কিছু করতে চাই, আর সেজন্য বিশ্বচর্চাকে করতে হবে অধিকতর জোরালো এবং একনিষ্ঠ।

আসলে আমাদের লক্ষ্য মানবতা, মুক্তি এবং সৃষ্টি বলেই সেই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য শিল্প-সাহিত্যে যথার্থ পথটা অবলম্বন করতে চাই। আর সে পথ হল, নিজের আত্মার মধ্য দিয়ে জাগরণ। সাগরসঙ্গমে পৌঁছবার জন্য আমরা রওয়ানা দিয়েছি; কিন্তু পরের পোশাক পরে, পরের খাদ্য খেয়ে, পরের দেশের ওপর দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; সেজন্য যাব নিজের দেশের ওপর দিয়ে, মাটি পাড়িয়ে, নদী সাঁতরে, পাহাড় ডিঙিয়ে গিয়ে সমুদ্রকে আমরা আবিষ্কার করব। পরগাছাবৃত্তিতে লাঞ্ছনা, অবমাননা এবং শেষে অপমৃত্যু; অপরপক্ষে জীবনের প্রতিষ্ঠা ও আকাঙক্ষার গন্তব্যে পৌঁছার জন্য দরকার স্বাবলম্বন। এটাই যথার্থ পথ। এমনকি যেখানে চাক্ষুষ বিদেশ-চর্চা, কিন্তু শিল্পসম্মত, সেখানেও। সেক্সপীয়রের রোমান ও ইউরোপীয় ইতিহাস ব্যবহার সার্থক হয়েছে এইজন্য যে, সেগুলি সমসাময়িক ইংরেজ-আত্মার আগুনে আরক্তিম হয়েই চিরন্তন। কীটস-এর হেলেনিজম, গ্যেটের অরিয়েণ্টেলিজম-এর সার্থকতাও এই কারণেই।

আধুনিক সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে জাতিত্ব-ভ্রষ্টতার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। শিল্পে জাতিত্বরসের মানে

যদি হয় সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি, তা'হলে তিনি নিশ্চয়ই অপরাধী হবেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি তাই? আমার মনে হয়, ঠিক উলটো। মূলতঃ চর্যাপদ থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত অন্য কোনো কবি বা লেখকের রচনায়ই বাংলাদেশ এমনভাবে আর রূপলাভ করেনি। সে প্রকাশ এমন সরস, এমন অজস্র ও বিচিত্র যে, অনেক সময় তাকে প্রাকৃতিক ঘটনার মতোই মনে হয়। এবং শুধু বাংলার জল, বাংলার মাটিই নয়, অন্তত অধিকাংশ ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বাংলার মানুষও। এক্ষেত্রে যেটুকু আদর্শবাদিতার দীপ্তি, তা সামগ্রিক শিল্পী-মানসেরই বিচ্ছুরণ আর সে বিচারের পরিধি স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণভাবে একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কথায় গানে রূপে রসে উপমারূপকে রবীন্দ্রমানসের প্রকাশ বাংলার সবুজ প্রকৃতি ও অক্লান্ত আত্মারই মহাগাথা?

নিজের চিত্র সম্পর্কে একপত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'আমাদের দেশের সঙ্গে আমার চিত্রভারতীর সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয়। কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তাব ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো বং বলো কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই, আমি বাঙালী বলে এটা আপন হতেই বাঙালীর জিনিস নয় এইজন্যে স্বতঃই এই ছবিগুলিকে পশ্চিমের হাতে দান করেছি। আমার দেশের লোক বোধ হয় একটা জিনিস জানতে পেরেছে যে, আমি কোনো বিশেষ জাতের মানুষ নই।

এক অর্থে কোনো কবি, কেনো শিল্পীই বিশেষ জাতের মানুয নয়; কারণ সে যখন পরিণতি (Maturity) লাভ করে তখন জীবনের রহস্য নির্ণয়ই তার লক্ষ্য এবং সেই বচনা আবেদনের দিক থেকে আঞ্চলিক গণ্ডীর ঊর্ধ্বে উঠে যায় স্বাভাবিকভাবেই। একথা মানি, এবং এও অস্বীকার করিনে যে, চিত্রকলার আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ মূলত ইউরোপীয় পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছেন; কিন্তু তবু, বলতে ইচ্ছে হয়, কোনো ক্ষেত্রেই তিনি বাংলার বাণী ও রূপকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি; ছাড়িয়ে যেতে পারেননি, সত্যিকারের শিল্পীর পক্ষে তা ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই। আর চিত্রকলায় তার পরিচয় হিসেবে বিশেষ বিশেষ রঙের প্রতি তার পক্ষপাতিত্বের সত্যটাই কি যথেষ্ট নয়?

এ জিনিসটাই স্পষ্ট করে বোঝা দরকার। আসলে যখন বলি, দেশকে জানো, সৎ হও, নিজের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করো—একে যদি কেউ মনে করেন স্থূলজাতীয়, পক্ষপাতিত্ব তা'হলে তা এই ভাবনার প্রতি অবিচার ছাড়া কিছু হবে না।

অবশ্য, ইতিহাসের এমন সন্ধিক্ষণ আসে যখন এই ধরনের জাতিত্ব-বোধেরও প্রয়োজন, প্রয়োজন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের জন্য। বিশ শতকের ইতিহাসের একটা বড় সত্য হল, পরাধীন ও অনুন্নত জাতিসমূহের মুক্তিসংগ্রাম, এই সংগ্রামের সৈনিক হিসেবে শিল্পীরাও এগিয়ে এসেছেন। এটা স্বাভাবিক। শিল্পের জন্য শিল্প, আন্তর্জাতিকতা বা চিরন্তনবাদ দিয়ে এই আত্মপ্রকাশকে বাধা দেয়ার চেষ্টা দুষ্কৃতিরই নামান্তর, এবং তাতে কোনো ফলও হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো নিগ্রো লেখক যদি তার উপন্যাসে শ্বেতাঙ্গ বর্বরতার চিত্র আঁকেন, এবং সে-চরিত্রের রং-রেখা যদি গভীর ঘৃণারও অভিজ্ঞান হয়, তবু সে মল্যবান হতে পারে। কারণ, এখানে তার লক্ষ্য মানুষের মুক্তি। প্রকৃতপক্ষে ঝর্ণার মূল উৎস মানবতা। আর সেজন্যই জাতিত্বের সকীর্ণতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এদিক থেকেই লা মিজারেবল, আঙ্কল টমস্ কেবিন, বা অগ্নিবীণার মূল্য কোনদিনই কমবার নয়।

তিন

মানবতাই মূল উৎস, কিন্তু সে যে একটা ধারণা মাত্র নয়, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। অনেকে কথাটাকে একটা শব্দ হিসেবে উচ্চারণ করতেই ভালোবাসেন। মহৎ হওয়ার জন্য একটুখানি কবিত্ব করতে কে না অভিলাষী? আর সে মনোভাব নিয়ে জিনিসটাকে যাঁরা দেখেন, তাঁদেরকে সশ্রদ্ধ আদাব জানিয়ে আমরা বলব, আমাদের দৃষ্টি একটু ভিন্ন রকম।

মানবতার সপক্ষে একটা শব্দ উচ্চারণ করার দামও কম নয় একথা স্বীকার করি; কিন্তু এই সঙ্গে এও বলি যে, দেশ ও কালের মধ্যে আকৃতি-সম্পন্ন যে মানুষ তাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এর অর্থ আমার সমাজের মধ্যেই, আমার প্রতিবেশের মাধ্যেই আমার মানবতাকে খুঁজে নিতে হবে।

প্রথম অস্তিত্ব, দ্বিতীয় সৃষ্টি—এই দুই কারণেই প্রত্যেক সৎশিল্পীর সম্মুখে এ একটা দাবীর মতো উপস্থিত হয়েছে।

অস্তিত্বের প্রশ্নটাই প্রাথমিক, কারণ অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত কিছুরই পরিসমাপ্তি। আর আমাদের অস্তিত্ব নানাভাবে আজ বিপন্ন, এই মন্তব্যে অতিশয়োক্তি নেই এই জন্য যে, বিদেশী শাসন ঘুচলেও তার রেখে যাওয়া আবর্তে অন্যান্য অনুন্নত দেশের মতো আমরাও হাবুডুবু খাচ্ছি। সে অমনি ভয়ানক, মধু-মেশানো বিষের মতো, শিরা-উপশিরায় ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়ে পরিশেষে আনে মৃত্যুর স্তব্ধতা। যুদ্ধের পরেও শান্তি আছে, কিন্তু চেতনা বিলুপ্তির পরে অপার শান্তি!

আমাদের সংকট কেটেও কাটছে না কেন, এ প্রশ্নের জবাব এই যে, বিদেশী শাসনের অবসান হওয়ার পরে চেতনার ভিত্তি গড়ে ওঠবার মতো কোনো সুযোগ তো সৃষ্টি করা হয়ইনি, উপরন্তু যেটুকু ছিল বা নিজের নিয়মে গড়ে উঠেছিল, তাকেও বিকশিত হতে দেয়া হয়নি। বিগত শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ও উর্দুকে স্বীকার করা হয়েছিল, যদিও সে ছিল কুড়িটি বৎসরের মতো বিলম্বিত সময়ের মুখাপেক্ষী। তবু সে ছিল সারাদেশের এক সত্য সংগ্রামেরই বিজয়চিহ্ন। কিন্তু সেই স্বীকৃতি যে ছিল দশ্যত, তার দৃষ্টান্ত প্রচুর। ন্যায্য অধিকারের দাবির কাছে সাময়িকভাবে নতিস্বীকার করলেও, স্বার্থবাদী মহল যে ঝোপ বুঝে কোপ মারার তালে ছিল না, তা আমরা বলতে পারি না। আর সেইজন্যই নতুন করে রোমান হরফ, তৃতীয় ভাষার ওকালতি, শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মাতৃভাষাকে ঝেঁটিয়ে তাড়ানোর চক্রান্ত। নিজেদের সুবিধের খাতিরে একটা জনমণ্ডলীকে পৌরুষহীন, নির্জীব ও পঙ্গু করে রাখার মতো মহৎ উদ্দেশ্য আর কি থাকতে পারে।

যাঁরা এসব চেষ্টা করছেন, তাঁরা সত্যই দেশপ্রেমিক ও সৎ হলে অন্য-পথে চলতেন। এবং নিজেদের অজ্ঞতার বোঝাকে ছলে বলে কৌশলে দেশের ওপর না চাপিয়ে নতমস্তকে মেনে নিতেন দেশবাসীর সম্মিলিত প্রজ্ঞাকেই। আর সেক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন আসত না। অঞ্চলে অঞ্চলে থাকত না এত সন্দেহ ও ঘৃণা। জাতি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি—সবদিকে স্বাভাবিক বিকাশের পথে আমরা এক জায়গায় গিয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারতাম। ভাইয়ের অধিকার ভাই হরণ করিনি বলে,

ভাইয়ের সুখে সুখী, ভাইয়ের দুঃখে দুঃখী হয়েছি বলে পরস্পরকে ভালোবসাতে পারতাম।

আত্মানুসন্ধান করতে গিয়ে কি দেখতে পাই? না, অতীতের মাকড়শার জাল, অশিক্ষা অজ্ঞতা কুসংস্কার, ক্ষুধা আর হাহাকার অনাহার আর মৃত্যু—জীবনের এমন নিষ্ঠুর অপচয় দুনিয়ায় আর কোনো ভূখণ্ডেই বোধ হয় নেই। চৌদ্দ বছর আগে যা ছিলাম, চৌদ্দটি বছরের মধ্যে দিয়ে এসে তা থেকে একচুল সামনে এগুতে পারিনি, বরং পিছিয়েছি দশহাত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন বলি, মানবতা তখন আমার দেশের পতিত মানুষ থেকে সেই উপলব্ধিকে যদি বিচ্ছিন্ন করে দেখতে না পারি, তবে সে নিশ্চয়ই অপরাধ নয়? এ যে আমার দেহ, এ যে আমার আত্মা। আমার রক্ত। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস। এর মধ্য দিয়ে জাগ্রত হতে পারলেই নিজে সৃষ্টি করা সম্ভব, অন্যথায় নয়।

বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য এবং বৈচিত্র্য কম নয়; কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, এর মধ্যে কতটুকুই বা আমার স্থান? এই যে আমি ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে আছি, পদ্মা মেঘনার চরে, শত সহস্র গ্রামে মাটির কাছাকাছি, পাহাড়ে, সাগরে, সাগরের দ্বীপমালায়? নেই, খুব বেশী নেই। একটি নীলদর্পণ, একজন পদ্মানদীর মাঝি যথেষ্ট নয়।

কাজেই যাঁরা শিল্পের জন্যই শিল্প বা শিল্পকে মনে করেন উপাসনার মাধ্যম, তাদেরকে বলি আপনারা রচনা দিন, সৃষ্টি করুন, সে ভাবে যদি সম্ভব। সানন্দে তা গ্রহণ করব। লোকশিক্ষা আপনি পছন্দ করেন না, কিন্তু আনন্দ তো দেবেন? অন্তত একটু অনুভূতি জাগাবেন? যদি কিছুই দিতে না পারেন, তা'হলে বুঝব আপনার কাজের সত্যই কোনো সার্থকতা নেই। এবং স্বাস্থ্যের খাতিরেই আবর্জনা সর্বদাই পরিত্যাজ্য।

আর যাঁরা উপলব্ধি করেন, মানবতার প্রতি শিল্পীর খানিকটা দায়িত্ব আছে, তাঁদের কাছে শুধু বক্তব্য এই: এতটুকু স্বীকার করার অর্থ হল দুঃখকে, সংগ্রামকে ও সাধনাকে স্বীকার করে নেয়া। এক্ষেত্রে আত্মপ্রবঞ্চনার স্থান নেই, অতীতে ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। গর্কির লেখায় পাওয়া যায়: একটি মেয়ে চিঠিতে লিখছে, আমার এত কথা বলবার আছে যে, না লিখে থাকতে পারছি না। অন্য একজন শ্রমিক লিখছেন, জীবনে এতকিছু দেখেছি যে, না লিখে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। গর্কি

বলছেন, প্রথমটায় রয়েছে দুঃখকে ভোলবার রোমান্টিক মনোবৃত্তি এবং দ্বিতীয়টিতে অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি (Richness)। এই দুই-ই আমাদের-প্রয়োজন।

তবে, সাহিত্যের দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলা এবং চেতনাকে পরিপক্বতার দিকে নিয়ে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য বলে দ্বিতীয়টি কাম্য, সমধিক। সাহিত্যের সেই দৃঢ় ভিত্তি কি? না, বাস্তবতা।

আমাদের সাহিত্যকে বাস্তববাদিতার সুদৃঢ় ভিত্তির 'পরে স্থাপন করার জন্য এমনকি, কিছুকাল পরিকল্পনা সহকারে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে সেই পরিকল্পনা নিশ্চয় প্রকট কিছু নয়, একটা পদ্ধতি মাত্র। অপরপক্ষে বলা যায় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাওয়া। লেখাটা যেমন ইস্কুলে শিখবার জিনিস নয়, তেমনি একজন লেখক কিভাবে বাস্তববাদী শিল্পী-ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন, সে সম্পর্কেও ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই, এ যেন দিন-রাত রোদ- বৃষ্টি আলো-হাওয়ার মধ্যে দিয়ে মাটির রস নিঙড়ে পান করে বৃক্ষের ফলদানের ক্ষমতা অর্জনের মতোই; তবে একথা ঠিক, সচেতনভাবে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, প্রস্তুতি একটা আছে, এবং সেটা বাস্তব জিনিস, আর সেজন্য বাস্তববাদী লেখকের পক্ষে জীবতত্ত্ব অর্থনীতি বা সমাজ-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা তার প্রতিভার বিরোধী নয়, বরং সম্পূরক।

যাঁরা প্রতিভার স্বাভাবিক নিয়মে কাজ করবেন তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া বাতুলতা। এদেরকে বাদ দিলেও একদল লেখক থাকবেন যাঁরা সজ্ঞান প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যাবেন এবং তাদেরই মূলমন্ত্র হয় যদি 'জীবন থেকে নেয়া' তা'হলে সেটা কোনক্রমেই নিন্দনীয় হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

'জীবন থেকে নেয়া' এর অর্থ হল যা দেখছি জানছি উপলব্ধি করছি, তাকেই যথাযথ আঙ্গিকে রূপ দেয়া। এবং সেক্ষেত্রে একজন গাল্পিকের কাছে তাঁর মস্তিষ্কজাত বা আহরিত রোমাঞ্চকর প্লটের বদলে তাঁর পাশের বাড়ির এমনকি তাঁর পরিবারের জীবনই হবে লেখার উপাদান। একটা গ্রাম, এলাকা, শিল্পাঞ্চল বা কর্মীজোটকে বেছে নিয়ে সত্যিকারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কেউ যদি উপন্যাস লেখেন, তা'হলে সেটার কি একমাত্র অপাংক্তেয় হওয়ারই আশঙ্কা? সবগুলো রচনা তো যান্ত্রিক নাও হতে পারে? অপর-

পক্ষে সৎ চেষ্টা থাকার দরুন অর্থহীন এলোমেলো বহু রচনার চেয়ে সেগুলো হবে মৌলিক মানবীয় মূল্যে উচ্চকিত, সজীব এবং সবুজ? আমাদের সাহিত্যের দৃঢ় ভিত্তিমূল তৈরী করবার জন্য এখন এইটিরই বিশেষ দরকার।

'কবিতা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয় বরং ব্যক্তিত্ব থেকে উত্তরণ', এবং অন্যান্য আঙ্গিকেও মহৎ শিল্পের এই মৌলনীতির সন্ধান এই চেতনার মধ্য দিয়েই শুধু পাওয়া যেতে পারে। কারণ অর্জনের সম্পূর্ণতা ব্যতীত বিসর্জন অসম্ভব। এদিক থেকে 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেইদিন হব শান্ত' যতটা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, তার চেয়ে বেশী ব্যক্তিত্ব থেকে উৎক্রান্তি। কবির হৃৎপিণ্ডের রক্তিমাভা কখন জাতির আত্মার আগুন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হয়তো তিনি নিজেই জানতে পারেন নি। আর এ শুধু জীবন থেকে নেওয়া নয়, জীবনের উত্তাপে চমকে ওঠা, সুতীক্ষ্ণ সুতীব্র হয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ তরুণ দেবতার মতো চীৎকার করে ওঠা। নন্দনতত্ত্বের কোন্ মাপকাঠিতে এ স্বল্পমূল্য?

চার

জীবন দিয়ে জীবন সৃষ্টি; কিন্তু জীবনকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সামগ্রিকতার মধ্যেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বপ্রক্রীড়ারত মেঘের সম্ভারকে কেন্দ্র করে উৎসারিত হলেও মেঘদূত বর্ষার কাব্য নয়, শাব্দিক রূপক অর্থে অনন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মার ক্রন্দনও নয়—বরং এ সত্যই প্রেমের কাব্য, কবিতার আকারে প্রিয়াবিরহী যক্ষের স্বগত সংলাপ। স্বগত সংলাপ, কিন্তু পরিণতির পরিপূর্ণতায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে আচ্ছাদিত এবং সেজন্য মেঘদূত নাটভঙ্গি বিরহিত হয়েও ক্লাসিক। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সংস্থিত মূল্যবোধ এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পরিণতি রূপের প্রবাহে কালিদাসের প্রতিভা অবগাহন করার সুযোগ পেয়েছিল।

ক্লাসিকের রূপ প্রসঙ্গে এলিঅটের মন্তব্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

'ক্লাসিক কি' প্রস্তাবে তিনি বলেছেন: ক্লাসিক কথাটি দিয়ে আমি কি বোঝাতে চাই তার যথাসম্ভব আভাষের জন্য যদি একটি শব্দের ওপর নির্ভর করতে হয় তাহলে সেই শব্দটি হল 'পরিণতি' (Maturity)

'ক্লাসিক তখনই সম্ভব হতে পারে যখন একটি সভ্যতা পরিণতি লাভ করে; যখন একটি ভাষা ও সাহিত্য পরিণতি লাভ করে; এবং ইহা অবশ্যই হবে পরিণত মনের সৃষ্টি।' সেই সভ্যতার গুরুত্ব, সেই ভাষার গুরুত্ব এবং এর সঙ্গে সেই নির্দিষ্ট কবির মনের প্রসারতাই দান করে চিরন্তন আবেদন।

এলিঅট বিস্তারিতভাবে তাঁর সংজ্ঞার তাৎপর্য আলোচনা করেছেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের অনেকাংশই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তবু সাহিত্য বা নন্দনতত্ত্বের কোনো মূল্যায়নকেই যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। একথা অবশ্যই ঠিক যে, নৈরাশ্য ও অস্থিরতার মধ্যে ক্লাসিক জন্ম নিতে পারে না কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অব্যবস্থিত যুগে মহৎ বচনা অসম্ভব। এমনকি, কোনো সময় ক্লাসিকও জন্ম নিতে পারে, তবে সেটা হবে নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। আর সেখানে কোনো একটা নির্দিষ্ট গুণাত্মক শক্তির প্রাধান্য অনুষঙ্গীক্ষেত্রের অপবিণতির শূন্যতাকে পূরণ করে নেয়। শিল্পী হিসেবে টলষ্টয় বড় না ডস্টয়েভসকি এ একটা প্রশ্ন এবং উপন্যাস হিসেবে ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট, ব্রাদার্স কারামাজোভ, ইডিয়েট—ওয়র এ্যাণ্ড পীস, রেজারেকসন বা আনা কারেনিনার চাইতে কোন অংশে ছোট সেটাও বিচার্য; কিন্তু তবু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ডস্ট্রয়েভসকির কোনো উপন্যাসই ক্লাসিক হতে পারে নি, কিন্তু টলষ্টয়ের ওয়র এ্যাণ্ড পীস এবং আনা কারেনিনা নিশ্চিতই ক্লাসিক। ভাষা সভ্যতার একই ধারায় দু'জনে সক্রিয় ছিলেন; কিন্তু ডস্টয়েভসাকিতে যেখানে প্রশ্নটাই প্রধান, টলষ্টয়ে সেখানে জীবনের সামগ্রিকতা। এখানেই দু'জনে স্বতন্ত্র। এবং অস্থিরতাকে বহন করেও যে ক্লাসিক হওয়া অসম্ভব নয় গর্কির মাদার তার দৃষ্টান্ত। এই বইয়ে উদ্ভিদ্যমান একটা নতুন মূল্যবোধের আর্তিই প্রধান; কিন্তু সেই মূল্যবোধ মানবতার আদি ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত বলে সেটা প্রশ্নমাত্র থাকেনি, বরং পেয়েছে ক্লাসিকের সংস্থিত বৈদগ্ধ্যের আয়তন।

তবে, সাধারণভাবে ক্লাসিক সর্বদাই সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য এবং ব্যক্তি-প্রতিভার পরিণতির মুখাপেক্ষী, এ অস্বীকার করা যায় না। এই তিনের সমন্বয় যেখানে যত গভীর, ক্লাসিক হিসেবে তার উচ্চতাও ততোধিক।

বলা বাহুল্য এই সমস্ত দিকেই আমরা শোচনীয়ভাবে পশ্চাৎপদ জাতি-সত্তা। আমাদের সভ্যতা অপরিণত, ভাষা ও সাহিত্য অপরিণত; কাজেই ব্যক্তি-প্রতিভার পারিণতি-অর্জনে সুযোগ খুবই কম, অথবা বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের দ্বারা তা অর্জন করলেও পশ্চাৎবর্তিতার গভীর ক্ষতকে ধারণ করে তা সার্থক হতে পারে না।

ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যে সভ্যতা এখনো শৈশবই অতিক্রম করতে পারেনি, এবং যার ভিত্তিটা জরাজীর্ণ, জোড়াতালি দিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা অর্থহীন। তাই স্থিতিস্থাপকতার আয়োজন ইতিহাসের গতিরোধ করারই প্রতিক্রিয়া। শিল্পকলার সাধককে একথা বুঝতে হবে নইলে তার পা চোরাবালিতে গিয়ে পড়বেই। তাঁকে বেরিয়ে আসতে হবে বলিষ্ঠতা নিয়ে সাধকের মতো, সৈনিকের মতো। কারণ তার ওপরে বর্তেছে পুরাতনকে ভেঙে দিয়ে নতুনকে গড়ে তোলার দায়িত্ব।

নতুনকে গড়ে তুলতে হবে, কারণ আমরা চাই সভ্যতার পরিণতি, ভাষা ও সাহিত্যের পরিণতি, মননের পরিণতি। এই যাত্রাপথে আমাদের রচনা ক্লাসিক হতেও পারে, নাও হতে পারে। দু-একটা যদি হয়ে যায়, সে উপরি-পাওনা। একেবারে না হলেও ক্ষতি নেই। কারণ আমরা যা রচনা করব তা হবে একটি নতুন সভ্যতা, নুতন ক্লাসিকের ভিত্তি।

১৯৬০

উপন্যাসের উত্তরণ

সৃজনীশিল্পে নিদারুণ সংকট চলছে বলে একটা মত সাম্প্রতিককালে সকল দেশেই অল্পবিস্তর বিদ্যমান। আর, কবিতা নাটকের মতো উপন্যাস সম্পর্কেও একথা উচ্চারিত হয়ে থাকে, যদিও তার মাত্রা কিছু কম। প্রশ্ন ওঠে, পাশ্চাত্যের অধিকাংশ আধুনিক লেখকের রচনা, সিরিল কন্নলির 'অশান্ত সমাধি' থেকে ধরে হেমিংওয়ের 'নদীর মধ্য দিয়ে বনের ভিতরে' পর্যন্ত কি মধ্যযুগীয় আর্তিমুখর নয়? গ্রাহাম গ্রীণ, ইভেলীন ভাগ, আর্থার কোরেসলারে তো শুধু কতকগুলি বনেদী মূল্যবোধের রূপায়ণ? ম্যাক্স বিয়ারবম, ই, এম, ফরষ্টার, খৃস্টোফার ইশারউডের মতো অসাধারণ প্রতিভা, যতদিন সক্রিয় থাকা উচিত ছিল, তার অনেক আগেই স্তব্ধ। জর্জ অরওয়েল কি আদৌ উপন্যাস লিখেছেন? ফকনার হার্ডিকে কতদূর ছাড়িয়ে গেছেন? ডস প্যাসস্ তো একজন ডাকসাইটে প্রচার-পুস্তক প্রণেতা মাত্র।

কিন্তু এই সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে, এইসব মন্তব্যের ব্যঞ্জনার্থ কি সে-সম্পর্কে বোধ হয়, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অনেকেই বেপথুমতি। এমনকি এখানে পালটা জিজ্ঞাসারও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আচ্ছা, উল্লিখিতদের ছাড়াও, জয়েসের ইউলিসিসের জটিল প্রতীকি ভ্রমণ, টমাস উলফের দুঃসহ নৈরাশ্য বা একেবারে হালে কামুর অবক্ষয়ী সাঙ্কেতিকতা কি শুধুমাত্র সংকটের পরিচয় প্রদানেই পরিসমাপ্ত? বিশেষত, র্গকি রোঁলা মানের প্রত্যয় তো প্রথম মহাযুদ্ধের রক্তদিগন্ত ছাড়িয়েই প্রস্ফুটিত?

জানি কিছু স্পষ্ট হল না। উচ্ছৃঙ্খল ইঙ্গিতে তা সম্ভবও নয়। কাজেই সকল ধাঁধাঁর যথাসম্ভব সদুত্তর পাওয়ার জন্য উৎসের দিকে ফিরে যাওয়াই ভালো।

শুধু নৃবিজ্ঞানের নয় নন্দনতত্ত্বের পণ্ডিতেরাও এখন এ বিষয়ে একমত যে, প্রত্যেক শিল্পরীতির উৎপত্তি ও রূপান্তর, জীব হিশেবে মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সমান্তরাল সমাজ-প্রগতির ধারার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম, আর তাকে নানাভাবে জয় করেই তার আত্মপ্রতিষ্ঠা, এবং এই প্রয়াসের অনিবার্য ফল, বিজ্ঞান, বস্তুবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ ও তাকে আপন সুখসমৃদ্ধির কাজে লাগাবার জন্য নতুনভাবে সৃষ্টি করার সূক্ষ্ম কারু-ক্ষমতার অর্জন। সেজন্য ফ্রান্সের গুহাগাত্রে আবিষ্কৃত অতিকায় বন্যপশুর প্রতিকৃতি, বা অজন্তার ফ্রেসকো, কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বহির্বিশ্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত আদিম মানবসন্তান পাহাড়ের গহ্বরের দেওয়ালে শিকারী পশুর আকৃতি-প্রকৃতি রেখায় ধরবার চেষ্টা করেছে, তা'তে নিছক সৌন্দর্যবোধের চাইতে তার অপরাজেয় অস্তিত্বের ঘোষণাটাই প্রবল। সৌন্দর্যবোধ অবশ্য এসেছে, সে চরম উদ্দেশ্য নয়, বরং তা গন্তব্যে সম্পূর্ণতার একটি উপায় মাত্র।

উপন্যাসের জন্ম এবং তার বহুমুখী বিস্তৃতির পুরাবৃত্তেও এই সত্য বিদ্যমান।

ভাষার উদ্ভবের কিছুকালের মধ্যই রূপকথা ও উপাখ্যানের ছায়াবৃত্ত ভাঙা জাগছিল, তা অনুমান করা যেতে পারে এবং এ-সমস্তই হচ্ছে কথা-শিল্পের দূরতম পূর্বপুরুষ। কিন্তু তাই বলে এ-সবের মধ্যে উপন্যাসের আঁতুড়ঘর খুঁজে বেড়ানো অবান্তর। তবে, এক্ষেত্রে একটি কথা প্রণিধান-যোগ্য, তা হল কথকতার চাতুর্য প্রদর্শন, বা আজগুবি ছবিতে অন্যজনের মন ভোলাবার জন্য এ সব গল্প-গাথার সৃষ্টি হয়নি। বরং বলা যেতে পারে, এ সমস্তের মধ্যে রূপ পেয়েছে সেকালের মানুষের বহুমুখী অভিজ্ঞতা, আবেগ অনুভূতি উৎকণ্ঠা, সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙক্ষা স্বপ্ন-কল্পনা, তার ভূয়োদর্শন সমাজনীতি, এমন কি, ধর্মীয় বোধ ও নৈতিকতা। বস্তুদর্শন তখনো ব্যাপক হয়নি, সুতরাং সিদ্ধান্তে ভুলভ্রান্তি; বিশ্বরহস্য তখনো অস্পষ্ট, সুতরাং তার বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি-পূজা; বহির্জগৎ তার চেতনার ঐক্যবোধে সমর্থিত হয়নি, সুতরাং তার পৌরাণিকতা।

জীবন এ ভাবেই নিজেকে প্রকাশ করেছে, এমনিতর রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধে, প্রকৃতির মতো। এই প্রকাশ স্বয়ং জীবন, শিল্প নয়। কিন্তু

মূলত ব্যক্তির দান শিল্পের মধ্যেও, সার্থক রচনায়, জীবন ঠিক এমনিভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে, বিজয়ী করে। তার একটি উদাহরণ, কথাসাহিত্যের প্রধান শাখা, উপন্যাস।

এ আজ সর্ববাদীসম্মত যে, ইউরোপের রেনেসাঁসই উপন্যাসের জন্মদাতা। রূপকথা উপাখ্যান আগেও ছিল, আর সে সবের সঙ্গে এর বংশ-সূত্রও আছে; কিন্তু তবু তুলনা নেই। ইউরোপে মানুষের সেই জাগরণ যেমন ছিল অভূতপূর্ব, তেমনি এই শিল্পরীতিও সম্পূর্ণ অভিনব। কথাকে লিপিতে বন্দী করে রাখার পদ্ধতি অনেক আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল, টেকনোলজির নবতর জ্ঞানে এবারে সে তৈরী করল মুদ্রাযন্ত্র, তার ফলে সাহিত্যের এই নতুন সম্পদ কয়েকজন রাজা, রাজপুরুষ ও সামন্তের গ্রন্থাগারের হস্তলিখিত পুথিতেই আবদ্ধ রইল না। যে জীবন তার পিতা, সে জীবনকে সে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিল। জীবন যেমন তার স্রষ্টা, তেমনি সেও হল জীবনের স্রষ্টা।

প্রকৃতপক্ষে, চৌদ্দ শতক হতে সতর শতকের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপে এই যে ঐতিহাসিক জাগৃতি তা দর্শনবিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি আইন-কানুন-ধর্মসমাজ-সংস্কার, নাটক সঙ্গীত চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য, এমনিতর বহুবিচিত্র ধারার সঙ্গে কেমন করে উপন্যাসকে সম্ভব করেছে, সে-বিচার চিত্তাকর্ষক। বিশেষ করে, উপন্যাসে জীবন-চিত্রণের সমস্যা ও প্রকৃতি, এর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে, খানিকটা আলোচনা প্রয়োজন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, রেনেসাঁসী দর্শনের মূলমন্ত্র, মানুষই যে মনুষ্যত্বের একমাত্র উৎস, সে উপলব্ধি। ব্যাপারটা আজকের দিনে মনে হতে পারে ফিকে, এবং অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু সে সময় এর প্রেরণা কতটা প্রচণ্ডতা নিয়ে এসেছিল, একটি নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। অবশ্য অতীতেও এর সমান্তরাল মনন বিরল নয়; এখানে গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের উক্তি স্মরণীয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, 'মানুষ জগতের সবকিছুর মানদণ্ড', এ ছিল তাঁর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এবং তাঁর এই মতবাদের ফলে গ্রীসের দাস-সমাজ কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়নি। অপরপক্ষে, রেনেসাঁসের জীবনদর্শন কোনো তত্ত্ব নয়, পাণ্ডিত্যিক মোহমুক্তি নয়, বরং এ স্বয়ং জীবন, তার অভিনব অভ্যুত্থান। আর তা সম্ভব হয়েছিল ইতিহাসের একটি মহতী গুণগত

উল্লম্ফনের দরুন, তা হল, ভূমিনির্ভর সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার ভগ্নদুর্গের উপর পুঁজিবাদী বণিকতন্ত্রের বিজয়পতাকা উড্ডীন করার ঘটনা।

কোনো প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক অন্ধ শক্তি নয়, মানুষই মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। নিজেই সে একদিকে উদ্দেশ্য, অন্যদিকে উপায়, রেনেসাঁসী জীবনবাদের এই প্রকৃতি সর্বাত্মক প্রকাশের আয়োজন সৃষ্টি করেছে এক নতুন আঙ্গিক, যার নাম উপন্যাস। অন্ধকার শতাব্দীর ঘুম থেকে জেগে ওঠা নতুন মানুষ নিজেকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করেছে অন্যান্য মাধ্যমেও, কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে তার রূপ অনেকটা খণ্ডিত। কিন্তু সুখ-দুঃখ প্রেম-প্রীতি হিংসাদ্বেষে প্রতিমুহূর্তে সংগ্রামক্ষুব্ধ ভিতরে ও বাইরে যে অন্তরঙ্গ মানুষ তার সামগ্রিক পরিচয় উপন্যাসেই বিশেষভাবে মূর্ত হয়েছে। সার্ভেন-টিসের ডন কুইকসোট কি সামন্তযুগের মৃত্যুগাথা নয়? বোকাচ্চিওর দেকামেরনে রাবেলের গাবগাঁতুয়া ও পাতগ্রুয়েলে, ডিফোর রবিন্সন ক্রুসোতে এবং বালজাকের কমেডি হিউম্যানী বা টলস্টয়ের যুদ্ধ ও শান্তির কাহিনীতে 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনে'রই নতুন নতুন দিক্‌দর্শন ও অভিযাত্রা।

বিচার করলে দেখা যাবে রেনেসাঁসী আবির্ভাবের ফলে উপন্যাসে যে চিত্র প্রত্যক্ষ, তার প্রধান লক্ষণ তিনটি, সে হল, ব্যক্তির জাগরণ, তার মুক্তিপিপাসা এবং জীবনের বিচিত্র সম্ভোগ-আকাঙ্ক্ষা। এই ব্যক্তি জাগ্রত, কারণ সে সামন্ত প্রভুর বিলাসিতার উপকরণ উৎপাদনে নিযুক্ত দাস নয়; তার আজ্ঞাপালক পারিষদ নয়, এমনকি তার মহিমা-কীর্তনের সভা-কবিও নয়। এই ব্যক্তি নিজের অসীম সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করেছে তাই সে অনন্য-পরতন্ত্র। সে মুক্তিকামী, কারণ সে ধর্মীয় কুসংস্কার, সামা-জিক দাসত্ব ও নিগড়ের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে-থাকা আরো বহুবিধ বন্ধন ছিন্ন করে নিজের ভাগ্যকে সে নিজের নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মাণ করতে বদ্ধপরিকর। সে জীবনভোক্তা, কারণ বুদ্ধিবৃত্তির আশ্চর্য বিকাশের ফলে সে বুঝতে পেরেছে, পরলোকে যত স্বর্গই থাক তাই বলে পৃথিবীতে এই জৈবিক অস্তিত্বের মূল্য কোনদিন থেকে কম নয়।

আগের যুগের মহাকাব্যের চরিত্রের সঙ্গে এখানেই তার মৌলিক পার্থক্য। মহাকাব্যের চরিত্র প্রকৃতি বা সমাজবিধির প্রতিপক্ষ নয়, বরং তার অংশ। সে জন্য সংগ্রাম শেষে ইউলিসিসের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত গৃহ ও

বিশৃস্ত প্রিয়ার পাশে, পঞ্চ-পাণ্ডবের উত্তরণ মহাপ্রস্থানের পথে। এখানে সংঘর্ষ, ধ্বংস, বৈরাগ্য ও নিয়তির আধিপত্য। কিন্তু উপন্যাসে তা নয়। উপন্যাসের ক্রুসো অকুতোভয় অভিযাত্রী, নতুন সাগরদ্বীপের আবিষ্কর্তা ও বিজয়ী। অথবা শুধু তাও নয়। একজন আধুনিক লেখকের কথা উদ্ধৃত ক'রে বলতে পারি: উহা 'কোথাও মহাকাব্যের ঐশ্বর্যসম্ভার-সহ মানুষের অন্তর্জগতের চিত্র উদ্‌ঘাটনে নিযুক্ত; কোথাও বা গীতিকবিতার রূপে, কোথাও সামাজিক পটভূমির ফ্রেমে জীবন-লীলার বৈচিত্র্য গাথায় ভরপুর কোথাও অবচেতন মনোরাজ্যের গহনে প্রবিষ্ট। দুই প্রাত্যন্তিক সীমানার মধ্যে নানা কাঠামো আর রঙে উপন্যাসের বিকাশ ঘটেছে। উপন্যাস শুধু কাহিনী নয়, কাহিনীর মাধ্যমে আরো জীবন ব্যঞ্জনা। গোটা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে দেখার এই শিল্পরীতি বণিক সভ্যতার অন্যতম অমর অবদান। অন্তরের গুপ্ত ও সুপ্ত জগতকে এমনভাবে প্রকাশ্যমান করার সামর্থ্য অন্য শিল্পরীতির মাধ্যমে কোনদিন সম্ভব হয়নি। এডমণ্ড উইলসন ফিল্ডিং রচিত 'টমজোন্সের' ভূমিকার প্রতিধ্বনি করে তাই ঠিকই বলেছেন, উপন্যাস আধুনিক যুগের এপিক। মধ্যযুগের শিল্পরীতির বিশিষ্ট দান মহাকাব্যে সমাজ ও মানুষের প্রতিফলন অনেকখানি দেখা সম্ভব ছিল। কিন্তু উপন্যাসের ব্যক্তিস্বরূপ ঢের বেশী গভীর ও ব্যাপক।'

এই পশ্চাৎপট মনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে, উপন্যাসে জীবনচিত্রণের মূলসূত্রগুলি মোটামুটি অধিগত হবে বলেই আমার ধারণা। অবশ্য, শিল্পের কোনো ব্যাপারেই শেষকথা বলা যায় না এবং সে হিসেবে সমালোচনা জিনিসটাই অসম্পূর্ণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার্য যে, প্রত্যেক বস্তুরই কিছু নিজস্ব ধর্ম থাকে, যা ঠিক কাঠামোর মতো, নানা প্রদাহমণ্ডিত অণুপরমাণুর মতো এবং যা বিশ্লেষণ ক'রে সেই বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব।

এদিক থেকে সহজভাবেই বলা যেতে পারে যে, উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু যখন মানুষ এবং সে মানুষ যখন কোনো বিমূর্ত (abstract) ধারণা নয়, বরং রক্তমাংসে গড়া সামাজিক জীব সেজন্য বাস্তবতাই এর প্রধান গুণ। জীবন সমালোচনা (criticism of life) লেখকের বিচিত্র হতে পারে, হতে পারে একান্ত আত্মমুখী বা বিকৃতির খাদের দিকে দ্রুত ধাবমান;

কিন্তু তবু সামাজিক পটভূমির বিন্যাস ও চেহারা সম্পর্কে তার অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিখুঁত ধারণা থাকা দরকার। এ একটা প্রাথমিক সর্ত্ত, যা যে-কোন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন উপন্যাস লেখককে মানতেই হবে। এমনকি প্রতীকবাদী, রূপক বা মনোধর্মী লেখা সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। কেননা প্রতীক বা রূপকেব স্বাভাবিকতার জন্য এই ভিত্তিভূমিতে সংস্থাপিত হওয়া ছাড়া তাদের উপায় নেই। পিড়ামিড, তাজমহল অথবা এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং গঠনকৌশলে ও আবেদনে বিভিন্ন হলেও প্রত্যেকের মূলই পৃথিবীর মাটিতে প্রোথিত।

তাহলে প্রশ্ন, এই ভিত্তিভূমি একজন লেখক কিভাবে অর্জন করতে পারেন? ইউরোপে বাস্তববাদের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা বালজাক তাঁর হিউম্যান কমেডির ভূমিকায় এতৎ সংক্রান্ত মূলসূত্রের প্রথম উপস্থাপনা করেন, যেগুলি এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রথমত, বৈজ্ঞানিকগণ যেমন অন্য জীবের বর্ণনা দিয়ে থাকেন, ঔপন্যাসিকের কাজও হল ঠিক তেমনিভাবে সামাজিক জীবের বর্ণনা দেওয়া। মানুষ সামাজিক জীব এবং পারিপার্শ্বি-কের বিভিন্নতার জন্যই তাদের চারিত্রিক বিভিন্নতা। দ্বিতীয়ত, ঔপন্যাসিক প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক সমাজের ঐতিহাসিক। সে হিসেবে তিনি যে কেবল তাঁর সময়ের মানুষের চালচলনের কথা লিপিবদ্ধ করবেন এমন নয়, ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের সর্বাত্মক অবহিতির জন্য তিনি অবশ্যই তাঁদের সংস্কৃতি বেশভূষা ঘরবাড়ি, কাজকর্ম--এককথায়, সমস্ত কিছুরই যথা বিবরণ দেবেন। তৃতীয়ত, সামাজিক ইতিবৃত্তকার যিনি উপন্যাস লেখেন সমাজের শুধু একটা বর্ণনা দিয়েই তাঁর সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। উপরন্তু কার্য ও কারণেব মধ্যকার সম্পর্ক তিনি অবশ্যই নির্ণয় করবেন। সর্বোপরি তিনি বৈজ্ঞানিক সুতরাং একটা নির্দিষ্ট ফলশ্রুতির জন্য যে সমস্ত কারণ দায়ী, সেগুলি তাঁকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে।

আর শুধু এই তত্ত্ববোধের মধ্যেই বালজাকের সন্ধান ক্ষান্ত হয়নি, তিনি সেগুলির সার্থক প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর মহাগ্রন্থ, যা এখন 'মানবীয় উপাখ্যান' বলে পরিচিত তাঁর পরিকল্পিত একশ' তেতাল্লিশখানা বইয়ের বিরাশিখানাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন এবং প্রথমে এই উপ-ন্যাসক্রমের নাম দিয়েছিলেন তিনি 'উনিশ শতকের রীতিনীতি পাঠ', **(Studies in the Manners of Nineteenth Century).**

এই নামকরণের মধ্যেই বালজাকের বিষয়-পরিচর্যার রীতি অনেকটা স্পষ্ট। পরে বইয়ের নাম পরিবর্তন করা হলেও তাঁর বীক্ষায় কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। আসলেও, একটা নির্দিষ্ট সময়ের একটা নির্দিষ্ট সমাজের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র তিনি অঙ্কন করতে চেয়েছিলেন এবং এ-ব্যাপারে তাঁর সাফল্য নাতিউচ্চ নয়। রাজা লুই ফিলিফের আমলে বর্ধিষ্ণু ফরাসী সমাজ তাঁর নীচুতলার আঁধার থেকে ওপরতলার আলোকের চূড়া পর্যন্ত এমন সততার সঙ্গে অন্য কোনো লেখকের রচনায় প্রতিফলিত হয়নি। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, ব্যক্তিগত জীবনকে একেবারে অস্বীকার করে আসুরিক মেহনতের দ্বারা এ যেন এক পরম আকাঙ্ক্ষিত প্রাসাদ গড়ে তোলবার সাধনা। তাঁর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত যথাযথ ছিল বলেই একই সঙ্গে ডাচেস ও দর্জিনী, ব্যাঙ্কার ও নিঃস্বের রূপ দিলেও এদের মতো অজস্র চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি অন্তর্লীন সমাজ সত্যের উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন। কিন্তু তবু মজা হল এই, তাঁর নামেও নালিশ আছে এবং তিনিও স্কট বুলয়ের ডিকেন্স সার্লট ব্রঁতে থ্যাকারে জর্জ এলিঅট রুশো মাদাম দেস্তাল এর মতো প্রকৃতিকে বিকৃত করার (**falsifying natures**) দায়ে অভিযুক্ত। মতটা চরমপন্থী সন্দেহ নেই। ঔপন্যাসিককে অবশ্যই বিজ্ঞানমনা স্বাভাবিক এবং সৎ হতে হবে; কিন্তু তাই বলে তিনি যে জীবতাত্ত্বিক (**Biologist**) নন একথাও ঠিক। সে হিসেবে তাঁর লেখায় সমাজ আলেখ্যের সঙ্গে এমন কিছু যদি থাকে যা স্থায়ী ও চিরন্তন এবং তাঁর চরিত্রগুলি যদি যান্ত্রিকতার অচলায়তনে বদ্ধ হয়ে থাকার বদলে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বার্থ সম্মান সুখদুঃখ ও হৃদয়াবেগ নিয়ে সর্বকোণে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তা হলে বুঝতে হবে, তা শিল্পধর্মের অনিবার্য ফল। আর সে ক্ষেত্রে, তাঁর রচনায় বাস্তবতার বিকৃতি ঘটেছে বলারও কোনো অর্থ নেই।

যাই হোক, স্তাঁদালীয় আত্মব্যবচ্ছেদ, বালজাকের নিরাবেগ কঠিন সমাজায়ন, বা জোলার প্রকৃতিবাদ, যে কোনো ক্ষেত্রেই, সাহিত্যে জীবন-চিত্রণের এই রহস্য বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে মানুষের জ্ঞান-চর্চার দু'টি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন ইতিমধ্যেই প্রকাশিত, তার একটি হল, 'সাম্যবাদীর ফতোয়া' (১৮৪৮) এবং অন্যটি ডারউইনের 'জীবনের উৎস' (১৮৫৯) ; প্রথমটি খুলে দিল সমাজ বিশ্লেষণের সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গি, এবং দ্বিতীয়টি ঘটাল পারলৌকিক মোহমুক্তি। আর যে দুঃসহ

মনোবিকলন আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম রীতি, তার জন্যও এই সামগ্রিক চৈতন্য বিস্তারের সমান্তরাল, ফ্রয়েড এডলার য়ুং পাবলভ এসে সে তরঙ্গকে তীব্র করেছেন মাত্র।

বিভিন্ন যুগে, মানুষের নানাবিধ সিদ্ধির সঙ্গে উপন্যাসের শিল্পরূপেও এসেছে নানা ভঙ্গি, নানা বৈচিত্র্য ও ব্যতিক্রম; কিন্তু তবু একটি কথা ঠিক এবং তা হল এই যে, উপন্যাস যেখানে সতিকারের উপন্যাস হয়ে উঠেছে, সেখানে সে নিজের একটি মৌলিক গুণ থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি; তা হল, সে সর্বদাই সমাজদর্পণ। সমাজ-সম্পর্কিত মানবগাথাই হল উপন্যাস, এমনকি, যেখানে সে কোনো একটি মেজাজ (**mood**) বা বিমূর্ত প্রতীকের (**abstract symbol**) পরিচায়ক, সেক্ষেত্রেও। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে হবে সমাজ নামক বস্তুটির নিষ্প্রাণ বিবরণ (**catalogue**) এবং নানা মানুষের হুবহু চিত্রণ (**Photograph**), বরং এই প্রতিপাদ্যের সঙ্কেত বোধ হয় এই যে, সমাজ বাস্তবতার নিগূঢ় পরিচয়কে নিয়েই হবে উপন্যাস শিল্পসমৃদ্ধ। এবং সে সমাজ কোনো স্থবির পদার্থ নয়।

উপন্যাসের সঙ্গে সংকট কথাটার যোগাযোগ কোথায় এইবার তা স্পষ্ট হতে পারে। আমার মনে হয়, উপন্যাসের সংকট মানেই হল, স্বধর্ম থেকে তার বিচ্যুতি, এবং এই বিচ্যুতির পরিমাণ অনুসারেই সংকটের ব্যাপকতা। আত্মব্যবচ্ছেদ বা মনোবিকলন, গোড়া থেকেই উপন্যাসের শিল্পকলাগত প্রতীতির বিরোধী নয়, বরং অঙ্গীভূত; কিন্তু আত্মব্যবচ্ছেদের নামে যে আত্মকেন্দ্রিকতা, এবং মনোবিকলনের নামে মনোবিকারের দিকে যে মনোযোগ তাতেই সংকটের উৎপত্তি ও বিস্তার। উপন্যাস যে সত্যই সংকটের কালোগহ্বরে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, ইউরোপ-আমেরিকার সাম্প্রতিক যে-কোন উপন্যাসের পাতায়ই তার প্রমাণ মিলবে; দুঃখ, হতাশা, আত্মনিপীড়ন, ধর্ষণ, হত্যা, আত্মহত্যা ও যৌনব্যভিচারের অত্যদ্ভুত ঘটনাবলী ছাড়া যেন দুনিয়াতে আর কোনো বিষয়ই নেই। এবং এ সমস্ত যে গোটা সমাজ-ব্যবস্থারই সংকটের ফল, তা'ও অত্যন্ত স্পষ্ট।

কাজেই, উপন্যাসের নব উদয়াচল জরাজীর্ণ বিষাক্ত অচলায়তন ভেঙে নতুন পৃথিবীতে মানুষের জাগরণের মধ্যেই শুধু উদ্ভাসিত হতে পারে।

সেজন্য, উদ্ভবকালের মতো আজকের ঔপন্যাসিকও মুক্তিযোদ্ধা। এবং এই যুদ্ধের মানে শুধু সমাজ পরিবর্তন বা বিপ্লবের একনিষ্ঠ চারণ হওয়াই নয়, একটি উপন্যাসে একটি কুসংস্কারের মাথায় যে আঘাত হানল, সেও এই আয়োজনের সঙ্গে শরিক হল। বলা বাহুল্য, এখানেও শিল্পীর স্বাধীনতাই মূলমন্ত্র।

আর এই সত্য সম্পর্কে যে সচেতন, একমাত্র তারই অধিকার আছে উপন্যাসের সংকট-মুক্তির সেই দুরূহ শিল্পকলাগত সাধনার পথে এগিয়ে যাওয়ার, যার অর্থ হল ব্যক্তিগত আত্মব্যবচ্ছেদের সঙ্গে সমাজগত জীবন্ত বাস্তবতার সম্মিলন ঘটানো। নতুন একজন ফিল্ডিং বা নতুন একজন জয়েসকে চাইনা আমরা; আমরা চাই স্তাঁদল বালজাকের একাত্মতা। এবং তার জন্ম আমার দেশের মাটির ঘরেও হতে পারে না কি?

১৯৬০

জ্ঞান হওয়া অবধি, ছাত্র অবস্থায়, কি এমনি পড়াশোনার সময়, যখনই রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে এসেছি, তখন, তাঁর প্রায় অতিলৌকিক প্রতিভার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে বিস্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কতগুলো প্রশ্নের হাত থেকেও রেহাই পাইনি। বিস্ময় যেখানে গভীর, ভক্তিতে তার প্রয়াণের সম্ভাবনাই বেশী; তবে বিশেষ মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমটাও স্বাভাবিক। সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রকরণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বলেই হয়তো আমার উপলব্ধি কেবল নিবেদনের মধ্যে নেতিয়ে পড়েনি বরং অধিকতর ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছিল।

কিন্তু এ পথে এগুতে গিয়ে ক্লান্তির কবলে পড়তে দেরী লাগেনি। এমনিতে সময় ও সুযোগ অল্প; তার ওপর, যদিও জগতের জন্য কোনো কবিই তাঁর মতো নানা প্রসঙ্গে নিজের রচনার এত বিশ্লেষণ করেননি, তবু সেগুলো বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময়। লেখকের ব্যাখ্যার নির্দেশক আলো না পড়লে, নিজের অর্থ-পরিমণ্ডল নিয়ে যে রচনা সাগর দ্বীপের মতোই রহস্যমণ্ডিত থাকত, এবং একেকজন পাঠকের কাছে একেক রূপে ধরা দেবার ক্ষমতা রাখত, লেখকের নিজের ব্যাখ্যার দরুন সেগুলো অনেকটা ফিকে হয়ে দেখা দিয়েছে। এবং এটা হতে বাধ্য; কারণ টীকাকার আর শিল্পী একই ব্যক্তি হতে পারে না।

অবিশ্যি একটি কথা ঠিক যে সৃজন-মূলক শিল্পের শতমঞ্জরীর শোভায় মুগ্ধ হলেও, অথবা রস বা আনন্দ ছাড়া তার কাছে কেউ-কেউ অন্যকিছু দাবী না করলেও, যে ভূমিতে তার শিকড় প্রোথিত মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার নাড়িনক্ষত্রের পরিচয় না দিলে তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি না হওয়ারই আশঙ্কা। এবং সে পটভূমি নিঃসন্দেহে স্থানকালঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্বের চতুর্মাত্রিক বিন্যাস। স্থান বিশ্বের একটি বিশেষ বিন্দু সন্দেহ নেই এবং

তার মূল্য আপেক্ষিক; কিন্তু তবু একান্ত ভৌগোলিক অর্থেও তা সত্য। আর সে হিসেবে শিল্পীর দেশজ প্রকৃতির সঙ্গে সমাজ আর পরিবেশও উপস্থিত। তার মানে ভাব বা সত্যকে যত বিমূর্ত (abstract) বলেই মনে করা হোক না তার স্থানিক আকৃতি অবশ্যম্ভাবী। এ মন্তব্য কাল-ব্যাপারেও প্রযোজ্য। আর, ঐতিহ্য শুধু ইতিহাস বা মৃত উপকরণ নয় বরং জীবন্ত প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের প্রবাহিত মাধ্যম বলেও, স্থান-কালের খাতের মধ্য দিয়ে সে নদী প্রবাহের মতোই বয়ে আসে; এবং শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে বংশগতির (Heredity) প্রভাব থাকাও সম্ভব, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সর্বদাই দ্বন্দ্বরত। কখনো সে জয়ী, আর কখনো বা পটভূমি কিন্তু দু'ক্ষেত্রেই, তার প্রতিক্রিয়ায় যে শিল্পকলা তা প্রকৃতপক্ষে সর্বাত্মক সমন্বয়েরই ফল। বিশেষত, ভাষা যে শিল্পের বাহন সে কাব্য বা সাহিত্যে এই সমীকরণ বহুবিচিত্র ভঙ্গিমায় প্রসারিত। কারণ, যত মন্ময় কল্পনাকেই প্রকাশ করুকনা ভাষা নিজের চারিত্রেই সর্বদা অনির্দিষ্ট পরিমাণে বিশেষের দিকে সমান্তরাল।

আর, এসব কারণেই নিজের রচনা সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য সব সময় হয়তো তাৎপর্যহীনতায় সঙ্কুচিত নয়। কিন্তু সে সমস্ত যাতে সাপ মারমার লাঠি হিসেব যত্রতত্র ব্যবহৃত না হয় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকাও সমীচীন। আলোচনার পরিপূরক হিসেবেই সেগুলোর মূল্য, নিক্তি হিসেবে মোটেই নয়। যেহেতু বলেছেন, তাঁর রচনা 'সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা' তবু চোখে এই বক্তব্যের চশমা লাগিয়ে নিজের বিচার-প্রয়াসকে অতিসরলী-করণের দিকে নিয়ে যেতে আধুনিক রসগ্রহিতাদের নারাজ হওয়া উচিত।

একথা ঠিক যে নির্জলা প্রকৃতিবাদ (Naturalism) প্রতিভার পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধন করতে পারে না; আর সে জন্যই হয়তো প্রত্যেক শিল্পীই অল্পবিস্তর চিন্তাশীল, এবং কোনো কোনো চিন্তানায়কও বটে। প্রজ্ঞানের সঙ্গে চিন্তার মিশেল মানে বিজ্ঞানের স্বীকৃতি। এবং তার অধিকার প্রত্যেক বড় রচয়িতারই কাম্য। তবে এও যথার্থ যে, তত্ত্বটা জীবনের স্বাভাবিক শিখা হওয়া চাই, নইলে তা অতি উৎসাহী মস্তিষ্কের স্বেদ হিসেবে শিল্পকে ছাইয়ের মতো কলঙ্কিত করবে। কারণ, বিষয়ের ওপর আত্মস্থাপনের নয়, বরং বিষয়গত আত্মব্যবচ্ছেদেই শিল্পের মুক্তি; এবং সেজন্য শ্রেষ্ঠ শিল্প

মানেই ট্র্যাজেডি। ঝড়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও নতুন নীড় রচনার আশ্বাসও তো একমাত্র সেই দিতে পারে?

অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, রবীন্দ্রনাথ কোনো বড় ট্র্যাজেডির স্রষ্টা নন; এমন কি, ছোটগল্পে মোপাঁসা কি চেখভের সমকক্ষ হলেও, ঔপন্যাসিক হিশেবে তাঁকে কি জোলা, বালজাক, টলস্টয় কি দস্তয়েভসকির পার্শ্বে বসানো যায়? কবিতায়, অনেকে বললেও সত্যিই তিনি গ্যেটের সমকক্ষ কি না, তা বলা মুশকিল। শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমেও তাঁর সিদ্ধি অসাধারণ, তবু প্রশ্ন থেকে যায়, সেসব মাধ্যমের জগদ্বিখ্যাত দিকপালদের সমান তিনি কি না। আসলে বিচ্ছিন্ন রচনা দিয়ে তাঁকে সরল এবং সীমাবদ্ধ মনে হয় নাকি?

অথচ একথাও ঠিক, সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথ, মানবসভ্যতার এক মহৎ দান এবং তিনি সকল কালের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে প্রধান একজন। এবং তিনি শুধু শিল্পীও নন, একটি দর্শন, একটি প্রতিষ্ঠান।

রবীন্দ্র-প্রতিভার কোন্ গুণাবলী তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে এক সারিতে বসিয়েছে সে বিচার চিত্তাকর্ষক হতে পারে। কিন্তু তার আগে তাঁর শিল্পী-সত্তার বৈশিষ্ট্যগুলো উপলব্ধি করা দরকার। মূল্যবোধের যে সংস্থিতি মহৎ সৃষ্টির জন্য দায়ী, তাকে বর্জন করে ইনিও সমীকরণ লাভ করেন নি একথা বলাই বাহুল্য; কিন্তু তাঁর মূল্যবোধ সে সর্বক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার রসায়ন নয় তা স্বীকার না করে উপায় নেই। গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লিস (জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯৬ অব্দ) নব্বুই বৎসর বেঁচেছিলেন, এবং এ-সময়টা ছিল এথেন্সের জন্ম, জাগরণ, বিকাশ ও আত্মরক্ষার যুগ; অজ্ঞাত লেখকের রচিত তাঁর যে জীবনচরিত আধুনিক পৃথিবীর হস্তগত হয়েছে, তা পাঠ করলে দেখা যায় অতীতের এই মহান লেখকের শিল্প সংগ্রামে কত সতেজ ও জীবন্ত ছিল। সে সংগ্রাম জাতির রক্তধারার সঙ্গে সঞ্চরমান। আর সেজন্যই, পূর্বনির্ধারিত রীতির মধ্য দিয়ে চলেও তিনি জীবনের মূলগত দুঃখ ও উত্তাপের সার্থক রূপকার হতে পেরেছিলেন। শেক্সপীয়রের জীবন এখনো গবেষণার বস্তু; তবু যেটুকু সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন হয়েছে, সেখানে এই একই সংগ্রামের সঞ্চয়ন। এদের সংস্থিতি অর্জিত, আহৃত নয়।

রবীন্দ্রনাথে এই আয়োজনের অনুপস্থিতি পীড়াদায়ক, কিন্তু তার জন্য আক্ষেপ করাও অর্থহীন। এই প্রস্তুতি ব্যতিরেকেও তাঁর যে সিদ্ধি সেটাই বরং বিস্ময়কর। এবং এখানেই বোধ হয়, তাঁর প্রতিভার অসাধারণত্ব। শক্তি সাধারণ হলে অনুর্বর প্রান্তরের ক্ষীণধারাটির মতো শুকিয়ে যেতে বিলম্ব ঘটে না। কারণ শ্রেষ্ঠ রচয়িতারা যেখানে মোহনার থেকে যাত্রা দিয়ে উৎস আবিষ্কারের চেষ্টায় তৎপর, যন্ত্রণা-বিদ্ধ ক্ষত-বিক্ষত, সেখানে ইনি গোড়াতেই আপন-স্বীকৃত এক উৎসের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। ভক্তেরা যাই বলুন, জীবনের শেষ বছরের লেখা ঐক্যতান কবিতার বক্তব্যের সবটুকু তাঁর বিনয় নয়, খানিকটা আত্মস্বীকৃতিও বটে যখন বলেন সমাজের উচ্চমঞ্চে সংকীর্ণ বাতায়নে বসেছেন; সে তো বৃহত্তর জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ : সেখানে সম্মান আছে, কিন্তু শিল্পীর পক্ষে তা নির্বাসন। অবশ্য, সে আবাস চিরস্থায়ী হত না যদি না সেখানেই পেতেন তৃপ্তি ও স্বস্তির বিস্তৃত উদ্যান।

আর তার সবচেয়ে বড় বৃক্ষটিই হল উপনিষদের দর্শন—যে তাকে ছায়া দিয়েছে, দিয়েছে ফুলফল উত্তরাধিকারের বীজ। অন্য বহুবিধ মত আদর্শ, বিক্ষোভ এখানে এসে মিলেছে; কিন্তু তার ভিত্তি নাড়াতে পারে নি।

এটাই আশ্চর্য ঠেকে যে, কোনো তত্ত্ব, সে যত সম্প্রসারণশীল ও ধারণক্ষমই হোক না, শিল্পীর কাছে এক অবস্থায় তার নিঃশেষ অবশ্যম্ভাবী অথচ এক্ষেত্রে দেখি তার উল্টো। নিজে ম্রিয়মাণ হওয়ার বদলে জীবনকে সে যেন অনুকম্পা দেখিয়েছে বারবার।

অবশ্য পটভূমির দিকে ফিরে তাকালে এ চিত্রকেও ততটা দুর্বোধ্য ঠেকে না। আমার তো মনে হয়, সামন্ততন্ত্রের সুস্থির কাঠামোর মধ্যে বণিক-পুঁজির অসমবিকাশের যে সংঘাত সমতল পাড়ের ওপর এ তারই ফেনিল রেখাচিহ্ন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে; কিন্তু তার ষাট বৎসর আগে থেকেই এই দ্বন্দ্ব ক্রমে দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল। বিশেষত ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত কালটি কলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালি সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। এই স্মরণীয় কালের মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন, নীলকরের হাঙ্গামা, বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর-গুপ্তের তিরোভাব (১৮৫৮), মাইকেল-দীনবন্ধুর আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয়

নাট্যশালা স্থাপন ও নাট্যসাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতির আত্মপ্রকাশের সূচনা। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় পুনর্বিন্যাসের এক বিপুল জটিল আবর্ত। ইতিহাসের এমনি সন্ধিক্ষণে সমাজ-মানসের তিনটে লক্ষণই বিশেষ লক্ষ্যগোচর: প্রথম, পুরনো ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য তার ধ্বজাধারীদের আক্ষেপ ও আস্ফালন, দ্বিতীয়ত, নতুনের আত্ম-প্রকাশে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য, এবং তৃতীয়ত সমন্বয়। তখনকার কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি-সমাজে শেষোক্ত লক্ষণের প্রধান পরিচয় ব্রাহ্ম- আন্দোলন। প্রাচীনের আবরণে নতুন শক্তিকে মানিয়ে নেয়ার এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রগতিশীল সন্দেহ নেই; কিন্তু জীবনের দাবিই যেখানে মুখ্য ছিল সেখানে ধর্মীয় কাঠামোর প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই তা তৃতীয় সংস্কারে পরিণত হল মাত্র। অপরপক্ষে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডই ছিল যথার্থ বৈপ্লবিক; কারণ তাঁর সংগ্রামের পশ্চাতে যে মূল্যবোধ সক্রিয় তা একান্তভাবেই রেনেসাঁ-আপ্লুত; মূলত এই পুরুষসিংহের উদার-হৃদয় ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মধ্যদিয়ে নতুন চেতনা সমাজদেহে সজীব রক্তের মতো সঞ্চারিত হয়েছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়েই সংঘটিত নীলবিদ্রোহ (১৮৫৮) বাঙালী সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করলেও, তার বৎসরখানেক আগের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চবাচ্য হয়নি। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, বিদ্রোহের বিপক্ষে গভর্নর-জেনারেলের নিকট কলকাতার জমিদার ও অভিজাত বণিকদের আনুগত্যপত্রের কথা বাদ দিলেও সাধারণভাবে তৎকালীন হিন্দু বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ এই ঘটনাকে ক্ষমতাচ্যুত নবাব-বাদশাহের আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তার চরিত্র বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব নয়, সে বিস্তারিত আলোচনার সামগ্রী; তবে এখানে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, উপরোক্ত মনোভাবের দরুন বিদ্রোহ-পরবর্তী কালে তাদের সুবিধাই হয়েছিল। কারণ, তখন বিদেশী শাসকদের অবলম্বনস্বরূপ এরাই হলেন নতুন নবাব।

সিপাহী বিদ্রোহের পেছনে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না, ভারতের বিভিন্ন স্থানে শত সহস্র দেশীয় সৈন্যের আত্মত্যাগটা সত্যি ব্যাপার ছিল, এবং তার পশ্চাতে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের প্রেরণাই যে জাগ্রত ছিল তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। এইজন্য আশুপ্রতিক্রিয়া হল

দ্বিবিধঃ এক, শাসকের দিক থেকে অধিকতর সতর্কতা, তার মানে ভারত-শাসনে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত, কোম্পানীর শাসনের পরিবর্তে পার্লামেণ্টের শাসন প্রবর্তিত হল। আর এর সঙ্গেই চলে ধর্ম, নৈতিকতা, ভাষা ও সাহিত্যের আমদানী, যার উদ্দেশ্য ছিল এদেশের আষ্টেপৃষ্ঠে গভীর নিগড়ে বেঁধে ফেলা; সর্বযুগে ঔপনিবেশিকতার এই তো সাধারণ ধর্ম। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্প অনেক কিছুই তারা ইচ্ছে করে দেয়নি, নিজের গরজে এদেশবাসী সে-সমস্ত অর্জন করে নিয়েছে যা পরবর্তীকালে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পেরেছিল। শাসনযন্ত্রের কর্মচারী তৈরী করবার জন্য স্থাপন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়; কিন্তু কালক্রমে শিক্ষার নিজের ধর্মেই সেগুলো হয়েছে জাতীয়তা-চেতনারও পীঠস্থান। দুই, সিপাহী বিদ্রোহের ফলে এর প্রতি অসমর্থন সত্ত্বেও নতুন ভারতীয় অভিজাত উপলব্ধি করলো শক্তিমান বিদেশীর পদলেহন করাটাই মোক্ষের একমাত্র পথ নয়। অন্য পথ আছে। এবং সশস্ত্র বিপ্লব পর্যন্ত তার সীমা। তাদের এই বোধ, শত অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও কিছুকাল পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল.।

এ-দুই লক্ষণের কথা এজন্য বলছি যে, সিপাহী-বিদ্রোহের পরে শাসক ও তাদের আশ্রিত শ্রেণীর মধ্যে ততটা দহরম-মহরম রইলো না। এই তথ্য আমাদের প্রয়োজন। প্রয়োজন এইজন্য যে, রবীন্দ্রনাথ যে আব-হাওয়ায় জন্ম নেন, তার প্রকৃতি তাঁর পূর্বপুরুষের জীবনচারণের থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। তাঁর দূরবর্তী পূর্বপুরুষদের পঞ্চানন ঠাকুর বিলেতী জাহাজে মাল সরবরাহ করতেন; তখন থেকে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত পুরোমাত্রায়ই বিদ্যমান ছিল। পরের জন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন; এবং পিতামহ নীলমণি নগদ এক লক্ষ টাকা ও প্রচুর সম্পত্তি রেখে যাওয়া সত্ত্বেও ঠাকুর পরিবারের ঐশ্বর্য সঞ্চয়ে তাঁর কর্মোদ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। তিনি দু'বার ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন; অথচ তাঁর অন্দরমহল ছিল বৈষ্ণব। শেষ দিকে ইংরেজদের সঙ্গে খানা-পিনা শুরু করলে স্ত্রী দিগম্বরী দেবী তাঁর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে-ছিলেন। তাঁর বিলাসবৈভব ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা যে জনশ্রুতির বিষয় হয়েছিল ইংরেজের দেওয়া 'প্রিন্স' খেতাবই তার প্রমাণ।

দ্বারকানাথের কর্মসাধনা ও জীবন-সম্ভোগ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এ নবতর সংস্কৃতি-পিপাসারই স্বাভাবিক ফলন। পুত্র দেবেন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে এর খানিকটা জের চলছে দেখতে পাই। কিন্তু শিগগিরই তিনি এমন পথ বেছে নিতে পারলেন, যার পরিণতিতে মহর্ষি আখ্যা জুটেছিল। এ যেন পিতার বিপরীতে অন্য একটি রেখা, অন্য একটি বিন্দু; কালের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মাঝখানে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন বেদান্তের শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেতে তাঁকে যে যথেষ্ট উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় মুহূর্ত যাপন করতে হয়েছে, তাঁর আত্মজীবনীতে এর স্বাক্ষর আছে।

আমি আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ উৎস আবিষ্কার করেননি, জন্মস্থানকেই উৎস বলে গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা সত্য, তবে একান্ত নয়। এর সঙ্গে এও সত্য যে, তাঁর মানস-পরিধি উৎসের স্থিরতার সঙ্গে উৎসের বাইরের চাঞ্চল্যকেও ধারণ করে আছে। এটাই এই কালজয়ী প্রতিভার দ্বৈতরূপ। এবং তা স্থানকাল ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্বের চতুর্মাত্রিক বিন্যাসেরই অনিবার্য পরিণতি।

বলা বাহুল্য, এই দ্বৈতরূপের রহস্য নির্ণয়ের সঙ্গে তাঁর সমগ্র রচনা ও কর্মধারার প্রকৃতি উপলব্ধির প্রশ্ন জড়িত।

তবে এ প্রসঙ্গে নতুন করে মনে রাখা দরকার যে, যে-কোনো সূত্রের চৌকস পরিধির মধ্যে ফেলে সৃষ্টিমূলক রচনার রসধারাকে সঙ্কুচিত করার আমি ঘোর বিরোধী। অথচ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই প্রবণতাকে একেবারে নাকচ করা সম্ভব নয়। তাই দুকূল রক্ষার জন্য এর আত্যন্তিক আগ্রহকে এড়িয়ে গিয়ে মোটামুটি একটি দৃষ্টিযোগ্য পথরেখা অনুসরণ করে যাওয়াই বোধ হয় ভালো। কারণ, সূত্রের প্রতি আগ্রহ ভালো সমালোচনারও যান্ত্রিকতার খাদে পা পিছলে পড়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচনার উপলক্ষ ও তাৎপর্য গ্রহণ করে রবীন্দ্রমানসের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই; কিন্তু এখানেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সৃষ্টি ব্যাপারটা সর্বদাই বিমিশ্রিত; তাই রসানুভূতির দিক থেকে কবির কাছে সে অভিজ্ঞতা চকিত মনে হতে পারে কিন্তু সেও অবিচ্ছিন্ন। দিনের সূর্যালোকে একটিও তারা দেখা যায় না আকাশে, কিন্তু তাই বলে আকাশটা কি তখন তারাহীন থাকে? তার মানে, আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করতে না পারলেও উৎস সারাক্ষণ বর্তমান এবং

সে সমানভাবেই ধারার মধ্যদিয়ে সঞ্চারিত হয়ে চলে। অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট কবিতাটির মধ্য যে দৃষ্টিকোণ তা সাধারণ এবং সকল রচনাতেই কোনো না কোনো ভাবে উপস্থিত। স্বপ্নভঙ্গটা আসলে কি? সে কি কোনো শুভ মুহূর্তে অলীক কল্পরাজ্য ছেড়ে এসে বিপুল বাস্তব-বিশ্বকে গ্রহণ করার আকস্মিক প্রেরণা ? না, ঠিক তার উল্টো। যে উৎসকে তত্ত্ব হিসেবে জানতেন, তাকে আবেগ দিয়ে উপলব্ধি।

এখন, সে উৎসের স্বরূপ কি তাই বিবেচ্য। বিচার করলে দেখা যাবে সে উৎস আর উপনিষদ-কথিত বিশ্ব একই—সে পরম, সে অদ্বৈত। সে যেন এক স্থিরবিন্দু যার থেকে আনন্দধারা উৎসারিত হচ্ছে, অনন্ত ফেন পুঞ্জের মতো রূপরস–শব্দ-স্পর্শ–গন্ধে ছড়িয়ে গিয়ে আবার সেই বিন্দুকেই স্পর্শ করতে চাইছে; প্রতিধ্বনি যেমন ধ্বনিরই অন্যরূপ। ধ্বনিকেই, বলা যায়, 'বিরাট পুরুষ' এবং তিনিই মূল। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন; কারণ তা তাঁর রচনার সর্বত্র এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে, তার বিচিত্র রূপকে চাক্ষুষ করতে খুব বেশী সতর্কতার দরকার হয় না। এখানে শুধু এটুকু বললেই হবে যে, দর্শনের ক্ষেত্রে তা একেবারে অচেনা নয়; কারণ, একে প্লেটোর আইডিয়া বা কাণ্টের অজ্ঞেয় সত্তার বন্ধু বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বৈতসত্তার কথা যে বলেছি, এখানে তার একটির পরিচয় পাই; এ সার্বভৌম, শান্ত, অচঞ্চল, আমার মতে, যা রবীন্দ্র-মানসের, অপরপক্ষে তাঁর স্বশ্রেণীর, সামন্তভাগের সামগ্রিক প্রতিরূপ। এ তাঁর অস্তিত্বেরই একটা অংশ, রসিক জমিদারের অন্দরমহলের মতো যা নাকি জনপদের কোলাহল থেকে দূরে স্নিগ্ধ পরিবেশে অবস্থিত। এবং এই লক্ষণের মধ্যে উনিশ শতকের সমাজ-বাস্তবতার এক প্রধান দিকের প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমার ধারণা—সে হল স্থিতিস্থাপকতার মনোভঙ্গি। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন এরই সাধনা করেছিলেন, এবং প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের একটি ধারা এক্ষেত্রে বড়ই কাজে লেগেছিলো। বণিক-পুঁজির প্রাথমিক প্রসারের ফলে, ইউ-রোপীয় ভাবধারার সংস্পর্শে এসে, সমাজে ভাঙাগড়ার চাঞ্চল্য জাগলেও, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩খ্রীঃ) পর থেকে ইংরাজ-সৃষ্ট জমিদারশ্রেণী একটা নিরুদ্বেগ নিরাপত্তা লাভ করেছিল; মাথার উপরে প্রভু আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে খাজানা বুঝিয়ে দিতে পারলে এরাই দেশের

সত্যিকারের প্রভু। এই সব জমিদারের অধিকাংশই নবাবদের নিয়োজিত গোমস্তাজাতীয় লোকদের থেকে উদ্ভূত। বিদেশী রাজশক্তির পিতৃস্নেহে তারা পালিত হতে থাকে। নিজের স্থায়িত্বের জন্য এরা লর্ড ওয়েলেসলীর সময়ে (১৭৯৮-১৮০৫) অধীনতামূলক মিত্রতাকেও (Subsidiary Alliance) সানন্দে মেনে নিয়েছিল। এই সন্ধির শর্ত ছিল, ইংরেজদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সামন্ত নিজের রাজ্যে একদল বৃটিশ সৈন্য পোষণ করবেন অথবা উহা পোষণের জন্য বৃটিশ সরকারকে টাকা দেবেন। তিনি অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে সন্ধি করতে পারবেন না, এবং নিজ রাজ্যে একজন বৃটিশ দূত রাখবেন। এর বিনিময়ে বৃটিশ সরকার তাকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন।

আয়তনে ছোটো হলেও রবীন্দ্রনাথের নিকটবর্তী পূর্বপুরুষেরা ছিলেন এই সামন্ত সমাজেরই সদস্য। এবং তাঁর সময়ে এর জের অক্ষুণ্ন ছিল। আর যদিও তিনি যখন এলেন, তখন 'পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র এখনো এসে পৌঁছায়নি' তবু, পরেও এই প্রখ্যাত পরিবারের অস্তিত্ব ছিল 'মহাদেশ থেকে দূরে-- বিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো।' আর, পরনের পায়জামা আচকান চোগা চাপকান তাজ পাগড়ি জাজিম ফরাশ মছলন্দ তাকিয়া আলবোলা বালাপোষ, আদবকায়দার চৌকস মোগলাই ঢংয়ের মধ্যে য়ুরোপীয় আধুনিকতা নানাভাবে প্রবেশ করতে থাকলেও তা কখনো বনেদী ভিত্তিকে নড়িয়ে দিতে পারেনি। এ ভিত্তি চোরাবালির ওপরে প্রতিষ্ঠিত; ফলে সেই কাঠামোর মধ্যে একটা নিশ্চিদ্র শান্ত আবহাওয়া; এ যেন পাকাপোক্ত দেয়ালঘেরা একটা উর্বর জমি, যার মধ্যে নানা ফুলের বাগান এক বাগানে জন্ম দিতে পারে। তার মাটি সংস্কৃতিবান শিক্ষিত মানসিকতা, কিন্তু তার সূর্য উপনিষদের দর্শন, সামন্তচেতনার আকাশে যে নিশ্চিন্তভাবে দীপ্যমান। এই দেয়ালঘেরা উদ্যানেরই এক একটি পুষ্প ভগবৎপ্রেম, বৈষ্ণবতা, সৌখিন রুচি, মানুষের প্রতি মরমী সহৃদয়তা।

কিন্তু আহৃত তত্ত্ব কখনো শৈল্পিক মূল্যবোধে পরিণত হতে পারে না, যদি না তা অভিজ্ঞতার আগুনে কিঞ্চিৎও দগ্ধ হয়। বিশেষত, যে তত্ত্ববোধ প্রায় ষাট বছরের শিল্পী-জীবনের একনিষ্ঠ বন্ধু, সেখানে এর অভাব অভাবনীয়। আর এক্ষেত্রে তা হয়নি। স্থান-কাল-ঐতিহ্যগত কারণে অনুকূল

হাওয়ায় ছিল, আমরা দেখতে পাব, এরপর একটি প্রচণ্ড আঘাতের ফলে এই মূল্যবোধগুলো চিরদিনের জন্য সংস্থিত হয়ে গেল। এবং তা নির্ণয়ের স্বপ্নভঙ্গ নয়—কারণ সে সাময়িক বিকার; অপরপক্ষে রবীন্দ্র-জীবনে সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতা হল, কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা।

শোভনতার খাতিরে বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, রবীন্দ্র-সমালোচকেরা এই ঘটনাটিকে বিশেষ আমল দেননি। অথচ আমার ধারণায় এ এমন একটা ঘটনা যা তাঁর শিল্প-অস্তিত্বের সর্বপ্রধান দিক্‌চিহ্ন। দিক্‌চিহ্ন এইজন্য, এই মৃত্যু আর দশ-পাঁচটা বিয়োগের মত আসেনি বরং ঝড়ের মতো এসে প্রবল আঘাতে সমগ্র অস্তিত্বকেই নাড়া দিয়েছিল। এ সময়ে, সেই মহিলার স্মৃতিতে তাঁর রচনাবলী, রচনা নয় যেন অগ্ন্যুৎপাত। প্রেম যেখানে অভিশপ্ত, তাঁর পরিণতি চরম ক্ষতিতে বিলীন হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু জীবন সর্বদাই স্থিতিস্থাপক, বিশেষত প্রকৃত শিল্পীর কাছে জীবনের আসক্তিটাই প্রবলতর বলে পরম দুঃখকেও সমন্বিত করে নিতে তারা পারদর্শী। রবীন্দ্রনাথের মতো জীবনরসিকের পক্ষেও তাই হয়েছিল। প্রবল অগ্ন্যুৎপাত ও ধুম্রউদগিরণের পর এভাবেই হল শিল্পীমানসের সমস্ত মূল্যবোধের সংস্থিতি। আর এ সাময়িক রেখা নয়, চিরন্তন চিত্র যা তার সারা অস্তিত্বে স্থায়িভাবে মুদ্রিত হয়ে গেল।

কিন্তু এও রবীন্দ্রমানসের একটি দিক মাত্র, এবং এই পরিমণ্ডলেই নিঃশেষ হলে তিনি হতেন হয় উৎকৃষ্ট ধর্মনেতা নয় নিকৃষ্ট কবি। কিন্তু এ দু'য়ের উল্টোটাই তিনি হয়েছিলেন, এইজন্য যে কালের রাখালের বাঁশীর সুর সেই প্রশান্ত অন্তঃপুরে সবদাই পৌঁছেচে। ফলে তার দ্বিতীয় রূপ, দ্বিতীয় সত্তা—যার কেন্দ্রে রয়েছে সৌন্দর্য-চেতনা ও মানবতা। তার প্রেম প্রকৃতি-প্রেম, স্বাদেশিকতা, যুদ্ধ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঘৃণা, সাম্য ও শান্তির জন্য ব্যাকুলতা এই বৃত্তেরই একেকটি তরঙ্গ। সবচেয়ে বড় কথা, এজন্যই তিনি হয়েছেন নতুন মানবতার অগ্রদূত। একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, 'আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে,

আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম-পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহা-মানবের মধ্যে, যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট'; আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি, তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি স্খলন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।'

১৯৬২

সাহিত্যের সংগে অন্য শিল্পকলার সম্পর্কের প্রশ্নটা প্রথমে কারো কারো কাছে উদ্ভটও মনে হতে পারে ; কারণ প্রত্যেক শিল্পকলা নিজ চরিত্রগুণে স্বতন্ত্র তো বটেই, উপরন্তু কোনো রচনা যে মুহূর্তে শিল্প হয়ে ওঠে, তখন, এমনকি সে তার গোত্রধর্মের বিশিষ্ট রীতিনীতিগুলোকেও ছাড়িয়ে যায়। আমি ভেবে অবাক হই ফাউস্ট্ কি শুধুই নাটক? সুদীর্ঘ সময় ধরে বইখানি লেখার কালে শুধু নয়, লেখকজীবনের শুরু থেকেই নিশ্চয় গ্যেটে সৌন্দর্যতত্ত্ব-মহাজনদের সূত্রাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ রচনাটি আমরা যখন পেলাম, তখন, তার আংগিকের ওপর দিয়ে হাঁটার বদলে মানবাত্মার আশ্চর্য সংকটের অভিজ্ঞানের মধ্যেই মন্ত্রমুগ্ধ অসহায় প্রাণীর মতো হারিয়ে যাই।

কিন্তু তবু কথা থাকে। শিল্পীর জীবন দ্বিতীয় জীবন বটে, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃতির মতোই বিচিত্র ও রহস্যগর্ভ; তবু, সে যে প্রকৃতি নয় তাও তো সত্যি? এবং এই অবস্থায় তার জন্মলগ্ন এমন কর্তা ও প্রকরণের সঙ্গে যুক্ত যাদের সীমাবদ্ধতা সহজেই স্বীকৃত। এই সুযোগেই হয়তো প্লেটো সকলরকম ললিতকলাকে বলেছিলেন অনুকৃতি। এক ঝাঁক তারা, একটি প্রবালদ্বীপ, নীলসমুদ্র সারসপাখির মেলা, এমনকি একটি ছোট্ট জুঁইও শিল্পী আমাদের দিতে পারে না ; অথচ এগুলোর সবকিছু, চোখের দেখায় যা আছে তারও চেয়ে অনেক পূর্ণ করে, সুন্দর করে তার পক্ষে দেয়া সম্ভব। কিন্তু সেখানে সে, বিখ্যাত গ্রীকের চিন্তায় বিধাতার পদাঙ্ক অনুসরণকারী মাত্র। এমন পণ্ডিত ও ধুরন্ধর লোকেরাই কোন জিনিস কেনবার আগে তার গড়নটা রংটা স্বাদটা যাচাই করে নেন; এবং সেজন্য তাঁরা কতকগুলো মাপজোক উদ্ভাবন করেছেন। কোনো কোনো জিনিস, সেই মতো না হলে, গাল দিতেও তাঁরা তৎপর। এমনকি, কেউ কেউ শিল্পীর অস্তিত্বের মূল্য সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলেন; তাকে বড়দরের

নকলনবীশ মিথ্যাচারী অসাধু ও দুর্নীতিপ্রচারক আখ্যায়িত করেন। এ অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে আমরা 'যুক্তিসঙ্গতভাবেই তাকে নগরীতে, যা হবে উত্তমশাসিত, প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করতে পারি, কারণ, সে প্রাণের এই অংশকেই জাগায়, পোষে ও শক্তিশালী করে; এবং ধ্বংস করে যুক্তিবাদী অংশকে। এ ঠিক তারই মতো যে, কোনো নগরীকে, দুষ্টের হাতে তুলে দেয়, উত্তম নাগরিকদের ধ্বংস করে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, কল্পনাশ্রয়ী কবিরা এমনিভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মনে দুষ্ট বিধি বপন করে, সে তার নিবোধ উপাদানগুলোকেই করে তৃপ্ত, যা বড়ো ও ছোটদের প্রভেদ নির্ণয় করতে অক্ষম বরং একই জিনিসকে কখনো করে বড়ো কখনো ছোটো। এবং সে এমন চিত্রই অঙ্কন করে যা সত্যের থেকে দূরে'।

কিন্তু দার্শনিক বা রাষ্ট্রনায়করা বাগানে বাগানে ফুল ফোটাকে যেমন বন্ধ করে রাখতে পারেননি তেমনি শিল্পরচনাকেও নয়। মানুষ অনাদিকাল থেকে প্রকৃতিকে জয় করতে চেয়েছে, এবং গড়ে তুলেছে দ্বিতীয় প্রকৃতি। সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, গভীরভাবে বেঁচে থাকবার এই সাধনাই তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতি। বিভিন্ন রূপে হলেও, সংগীত নৃত্য চিত্রকলা ভাস্কর্য সাহিত্য এরই নানা শাখা-প্রশাখা, যুগে যুগে আনন্দে ও আবাদে মুক্তিপিয়াসী আত্মার চিরন্তন গাথা।

সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পের সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, আমার মনে হয়, এর সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত, নইলে আবিষ্কারের গরজে অতিরঞ্জনের শিকার হওয়া বিচিত্র নয়। একথা বলছি দুটি কারণে। প্রথম প্রাচ্যের শিল্পান্দোলন, যদি আদৌ কিছু থাকে, এতই ঐতিহ্যপরায়ণ ও আটপৌরে যে, এখানে বিভিন্ন শিল্পের পারস্পরিক প্রভাবের আয়তন স্বভাবতই সঙ্কুচিত; এর কারণ বোধ হয় আমরা যতটা না জীবনরসিক তার চেয়ে অনেক বেশী দার্শনিক। দ্বিতীয়, যে আংগিক বৈচিত্র্যের জন্য তারা পৃথক তার পরিধি ছাড়িয়ে এসে এদের অন্যকে মুগ্ধ করার ক্ষমতাই কতটুকু ?

এই পটভূমি স্মরণে রেখেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর শুরুতেই যে প্রশ্ন জাগে, তা হ'ল, সাহিত্যের সঙ্গে অন্য শিল্পের সম্পর্ক বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি। গতযুগে বাংলার প্রায় প্রত্যেক নাটকেই

অঙ্কের শুরু বা দৃশ্যের শেষে সুরতালসহ গান দেওয়া হত, এবং মাঝে মাঝে, নাচনেওয়ালীর সাজে সজ্জিত ছোকরা বা ঘাগরা ঘুঙুরপরা সত্যি-কারের খেমটাওয়ালীর আবির্ভাবও বিরল ছিল না। এই না দেখে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো তরুণ গবেষক তার থিসিসের নাম রাখেন 'উনিশ শতকের বাংলা নাটকে সংগীত ও নৃত্যের প্রভাব' তা'হলে তার উৎসাহের প্রশস্তি গাইব, কিন্তু বুদ্ধির তারিফ করতো পারবো কি? মম গগাঁকে নিয়ে লিখেছেন 'মুন এণ্ড সিক্সপেন্স,' কিন্তু এটা নিশ্চয়ই সাহিত্যে চিত্রকলার প্রভাব নয়? রঁদার বালজাক-মূর্তি নয় সাহিত্য কর্তৃক ভাস্কর্যের স্কন্ধারোহণ?

আসলে সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পের সম্পর্ক বলতে আমরা যে এ-ধরনের ব্যাপারকে বোঝাতে চাই না তা অতিশয় স্পষ্ট। তবে এরা যখন একই বাগানের ফুল এদের পরস্পর সম্পর্ক একটা আছে নিশ্চয়ই। আমার বিবেচনায়, অন্তত দু'টি দিক থেকে সে সম্পর্কের প্রকৃতি যাচাই করে দেখা সম্ভব। সে হল এক, বিষয়, দুই—প্রকরণ।

এর বিস্তারিত বিশ্লেষণের আগে সাহিত্যের দু'টি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন রস ও রূপ। 'রসের অনির্বচনীয়তা নিয়ে' যাদের কারবার তাদের 'ব্যবসা সর্বদা ফেল হবার মুখে থেকে যায়,' কারণ 'যুগে যুগে এই রসের স্বাদ সমান থাকে না; তার আদরের পরিমাণ ক্রমশই শুষ্ক নদীর জলের মতো তলায় গিয়ে ঠেকে।' 'কিন্তু,' তিনি বলছেন, 'এই রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। তারপর একটা দিক আছে যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাস নয়, ধ্বনি নয়, ঝংকার নয়। বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলাম, 'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই দু'টি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা যতি-মাত্রায় গূঢ় নয়—তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণবিন্যাস সেই রসের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে যায় না। এইজন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর'।

কবি-কথিত সাহিত্যের 'এই চিরন্তন চিত্রশালায় লেডী ম্যাকবেথ ও কিং লীয়ার, এ্যানটনি ও ক্লিওপাট্রা, সখিপরবৃতা শকুন্তলা, ভাঁড়ুদত্ত কি ফলস্টাফ নিজ নিজ মূর্তিতে উজ্জ্বল, এদেরকে ভোলার পথ নেই'।

একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে সাহিত্যের এই চিত্রগুণ ও চিত্রশিল্প এক জিনিস নয়। দু'ক্ষেত্রেই মানুষের মূর্তি-কল্পনা সম্ভব, কিন্তু তাদের একটি হল ভাষার সংকেত, আর একটি রং ও রেখার অবয়ব। এই প্রকরণের গুণেই দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু।

এবারে মূল প্রসংগে আসতে পারি। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে প্রত্যেক শিল্পই নিজ নিজ মর্যাদা ও মহিমায় উদ্ভাসিত; এবং পিছনে প্রয়োজনের তাগিদ থাকলেও এরা অল্পবিস্তর সৌন্দর্যসম্ভোগ ও মানসক্রিয়ারই প্রতিভূ। কিন্তু আদিম সমাজে এরা শিল্প ছিল না, ছিল জীবনাচরণেরই অন্যতম অবলম্বন। আদিম নরগোষ্ঠি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে বশে আনার জন্য সম্মিলিতভাবে সংগঠিত কণ্ঠস্বর ও নিয়ন্ত্রিত দেহচ্ছন্দে প্রতিদিন কিংবা ঋতুতে ঋতুতে যে উৎসবে মেতে উঠত, সমাজতত্ত্বের পণ্ডিতেরা তাকে বলেছেন জাদু (magic), সেই নৃত্যগীত শ্লোকই তো শিল্পের আদি উৎস? আর উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য বিভিন্ন উপাদানের সমন্বিত শক্তিতে একটি অব্যর্থ সিদ্ধি অর্জন?

তবে, এক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হলেও এরা তখনো পরস্পর স্বতন্ত্র ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। এবং পরবর্তীকালেও যে বৈশিষ্ট্য মূলত এই স্বাতন্ত্র্যের নিরূপক, তা'হল উপাদান ও প্রকরণ। এ-দুয়ের নিজস্ব নিরপেক্ষ রূপের অস্তিত্ব আছে ঠিক, তবু তারা শিল্পীবিশেষের প্রয়োগেই যেমন সার্থক তেমনি ব্যক্তিভেদে বৈচিত্র্য দ্বারাও শিহরিত।

ভাষাশিল্প হরফের চাক্ষুষরূপে মুদ্রিত থাকলেও সে নির্মাত্রিক, কারণ হরফটা তার উপাদান নয়, উপাদানের সাংকেতিকরণ মাত্র। উপাদান মানুষ প্রকৃতি কল্পনা, বা এসবের বিমিশ্রণ। সে আপন স্বভাবেই বস্তু ও ভাবনার ধ্বনিপ্রতীক, উপরন্তু বিভিন্ন কবির মানস-বাহন হয়ে সে নতুন নতুন চিত্রকল্প ও প্রতীকের জগৎ সৃষ্টি করতেও তৎপর। প্রতীকের এই দ্বৈতসত্তা যেন বাতাসের ভিতরে বাতাস, আকাশের মধ্যে আকাশ। নীড় পাখির বাসা, এবং তা প্রকৃতিকে চিনে নেওয়া ও তার নানা প্রকাশের নাম-দেওয়া পৃথিবীর পথিক মানুষেরই উদ্ভাবন, কিন্তু 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' কবির সৃষ্টি। তার একক বলা যায় বিজ্ঞান, অন্যকে প্রজ্ঞান। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, চিত্রকল্প ও প্রতীক যেহেতু শিল্পীর অভিজ্ঞতাসঞ্জাত মূল্যবোধেরই প্রতিরূপ, আর যেহেতু সেই অভিজ্ঞতার

জগৎ মানুষ ও বিশ্ব বৈ কিছু নয়—সেজন্য বহুকাল পর-পর ভূ-স্তরের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের মতো এর গুণগত রূপান্তরও লক্ষণীয়। যতই আকাশচারী হোন, কবি বা লেখক সমাজের লোক, এবং সে-সমাজ নিয়ত সম্প্রসারণশীল। তার সংগে সংগে ভাষাও। ভাষার এই ধ্বনিগত রূপান্তরের ফলই ইতিহাসে প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগ বলে চিহ্নিত চর্যাপদ সহজিয়াদের গান, আলো-আঁধারি বুলিতে রচিত; কিন্তু তাতে যতই অস্পষ্টতা থাক, সে আধুনিক কবিতার শামিল নিশ্চয়ই নয়। তেমনি ময়নামতীর গান, চণ্ডীমঙ্গল কি ইউসুফ-জুলায়খা কালগুণেই কাহিনী-কাব্য। এদের ভাষা নয় বরং কাহিনীগুলোই একটা-কিছু জীবনবোধের প্রতীক।

সাহিত্যের সংগে, একেবারে গোড়া, মানে প্রাচীনের বনভূমি থেকে আধুনিক কালের রুপালি দরোজা পর্যন্ত যে দুটি শিল্প হাতধরাধরি করে এসেছে সে হল নৃত্য ও সংগীত। এদের সঙ্গে অভিনয়ও অবশ্য আছে। এরা যেন এক চারণের তিন কলাবতী সখি। তাদের প্রেম ও পরিচর্যা দিয়ে কাব্যকেই সার্থক করেছে। গ্রীক হয়তো ব্যাতক্রম; কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা বিশেষত প্রাচ্য মহাদেশে বহুকাল পর্যন্ত লিপি-সাহিত্যের তল্পি-বাহক হয়নি, যদিও মৃতদের বই তালমুদ কি গিলগামেশ উপাখ্যানের বিবরণকে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত ঠেলে দেয়া যায়। পোড়ামাটি পেপিরাস ভূর্জপত্র কি তুলোট কাগজ, যাতেই লেখা হোক, একখণ্ড মূল্যবান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির মালিক হতেন সাধারণত রাজা বাদশাহ বা ধর্মমন্দিরের পুরোহিত; কিন্তু হয়তো এ বই অন্যরূপে মানে স্মৃতিও গীতিতে বৃহত্তর জনসমাজেও প্রচলিত থাকত। নজির হাম্বুরাবির বিধান, রামায়ণ মহাভারত। হাতে লেখা বই সাধারণত লোকের কাছে থাকত না এমন নয়; কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা নিশ্চয়ই নগণ্য। মহাকাব্য ও গাথা, একাধারে ইতিহাস কাব্য ও নীতিশাস্ত্র ছিল বলেই সে-সবের আবৃত্তি ও শ্রবণ ছিল সামাজিকের কাছে প্রায় ধর্মানুষ্ঠানের মতো, আর সেজন্য খুব, গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে যথার্থভাবে সংরক্ষণ অন্যদিকে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপন এই দু'কারণেই সংগীত নৃত্য অভিনয় হল কাব্যের নিয়ত সংগী। কবিদের তখন শুধু লম্বা চুল রেখে পদ্যরচনা করলেই চলত না, তার অবদানকে সুরতাল অভিনয় যোগে স্বকণ্ঠে সকলের সমুখে হাজির করতে হত। আর তাল কেটে গেলেই সব বানচাল।

কিন্তু এই লক্ষণকেও সাহিত্যের ওপর সংগীত ও নৃত্যের প্রভাব, বলা যায় না; কারণ প্রভাব মানে আক্রমণ, অনুসরণ নয়।

মূলত সাহিত্য সংগীত নৃত্য চিত্রকলা ভাস্কর্য অভিনয়, সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র, নিজস্ব উপাদানসমন্বিত দেহগুণেই এরা পরস্পর স্বতন্ত্র। এই দেহগুণ বা আংগিক কথাটার ওপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই; কারণ এটাই চরম। এরই ফলে একই বিষয় নিয়ে রচিত হলেও ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের আবেদন পৃথক। ধরা যাক একটা থীম 'প্রেম', বলে দেওয়া হল যে, যুক্তি-বিচারের ধার ধারে না; সে অমোঘ অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য। একজন কবি একজন ঔপন্যাসিক একজন নাট্যকার, একজন চিত্রী ও একজন ভাস্কর নিজ নিজ মিডিয়ামে রচনায় ব্যাপৃত হলেন। কিছুদিন পরে তাদের মালমাত্তাগুলো এনে দেখা গেল এলাহি কাণ্ড: কবির কাব্য পড়ে বুকে হাহাকার; উপন্যাসে জানালাম ললিতার কাহিনী, নাটকে লবঙ্গ-লতিকার আত্মত্যাগ, কম্পোজার গেয়ে উঠলেন প্রেম তুমি ছলনাময়ী সোনার হরিণ তবু সুন্দর অনামিকা; ভাস্কর পাথর কুঁদে রূপ দিলেন পুরুষ ও নারীর, অবিশ্যি আধুনিক ভংগিতে, যার ফলে মাথা পাটনাই আলুর মতো, হাতজোড়া বেলচা আর বুক জুড়ে লোহার খাঁচা; আর চিত্রী সে নিকারেগুয়ারই হোক বা ঢাকারই হোক, ক্যানভাসের ওপর পাহাড় নদীর জ্যামিতি চাপিয়ে এমন এক মেয়ের ছবি আঁকলেন. যাদের সম্বন্ধে হিন্দু ঋষিরা লোকশাস্ত্রে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন! অথবা দেখা যাবে সে রমণীই নয়, চড়াই উৎরাইয়ের পাদদেশে উদ্যানের ধারে এক ধানীজমি!

ব্যাপারখানা যখন এই তখন বিভিন্ন প্রকরণের সাধক এক-একজন শিল্পীব এক-একটি কীর্তির সামনে গিয়ে আমরা এক এক রকম রোমাঞ্চ অনুভব করবো, তাতে আর বিচিত্র কি। এবং সে অনুভূতি, সারাক্ষণ, প্রেমসংক্রান্ত নাও হতে পারে।

জাঁ পল সার্ত্রর একটি মন্তব্য এখানে স্মরণীয়। বলেছেন, রং আর ধ্বনি নিয়ে কাজ করা হল এক জিনিস আর শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা অন্য। উপরন্তু প্রতিভাবলে শিল্পীর প্রকরণগত বৈচিত্র্য-সাধনের স্বাধীনতা তো রয়েছেই।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকে। এবং তা হলে, শিল্পকলার প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হলেও সাহিত্যের সংগে অন্যান্যের কোনো কোনো সম্পর্কই কি নেই?

যদি থাকে তার সীমা কতটুকু? জবাবে বলা যায়, বিশ্বের কোন কিছুই একে অন্যের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, বিশেষ এরা তো সমজাত। বনের গাছও পরস্পরকে আকর্ষণ করে; বড় গাছে বেড়ে ওঠে লতা, আর বড়গাছও তাতে শ্রীমণ্ডিত। কাছাকাছি নদীরা একে অন্যকে স্পর্শ করে মাটির ভিতর দিয়ে ধারা পাঠিয়ে, তাতে সবাই খানিকটা সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ। সকল শিল্পেরই যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে রূপে ও রসে মানবাত্মার সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন খাতে বয়ে গিয়ে একই সাগরসংগমে পৌঁছা, তা'হলে একে অপরের দিকে নজর রাখবে, এটাই স্বভাবিক। চাই কি, আকর্ষণীয় হলে, কোনো কোনো জিনিস গোপনে শুধু নয়, প্রকাশ্যেও পরস্পর ধারের ব্যবসা চালাতে পারে; কাব্যলক্ষ্মী যদি মনে করেন নতকীর পায়ের মঞ্জরী কোমর-বাঁকানো আর ভুরুর ভংগিমা মন্দ নয়, তা'হলে রংগমঞ্চে ঢুকে সেগুলো আহরণের জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নিলেও কারুর কিছু বলবার নেই। কারণ, সব চুরি নয় যদি তাতে থাকে চাতুরী।

সংগীতের কাঁধে চড়ে চললেও, প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্য মাত্রই চিত্রধর্মী। সুরে বা সুরমণ্ডিত আবৃত্তিতে তা পরিবেশন করা হত ঠিক কিন্তু কবির স্পষ্ট উদ্দেশ্য প্রকৃতি অপ্রাকৃতিক শক্তি দেবদেবী বা নিয়তি যার সংগেই হোক মানষের সম্পর্কের বর্ণনা। এবং তাতে সারল্য ও পুংখানুপুংখতার ঝোঁকটাই প্রবল, কারণ তার শ্রোতা জনসাধারণ; এমন কি রাজার রুচিও তাদের অন্তগত। মানব-মূর্তিতে সসংবদ্ধ বলে কাহিনী স্বভাবত মাত্রাসম্পন্ন, উপরন্ত বর্ণনায় এই বস্তু-প্রবণতার ফলে সেযুগের কাব্যগুলোর কোনো কোনো জায়গায় চিত্রকলার দ্বিমাত্রিক তো বটেই, এমনকি কোথাও কোথাও ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রিক মায়া (illusion) সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ্য করুন, গীতিপ্রবণ কাব্য হওয়া সত্ত্বেও রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত মেঘদূতের ভ্রমণ, প্রতি পদক্ষেপে আশ্চর্য জীবন্ত চিত্রের সমারোহ; এখানে শুধু মাত্রা নয়, বর্ণ-গন্ধ যেন উপস্থিত। আলংকারিক এবং মূলতই কৃত্রিম সংস্কৃত রীতিতে লেখা, তবু আলাওলের পদ্মাবতী রূপবর্ণনায় 'আপাদলম্বিত কেশ কস্তুরি সৌরভ, মহা-অন্ধকারময় দৃষ্টি পরাভব', কিংবা সৈয়দ হামজার 'সহজে রূপের ভারে আপনি চলিতে নারে, নবীন যৌবন তাহে ভার। রূপের মুরারি বালি ক্ষেণে মধ্যে চলি,

কেমনে বহিবে অলংকার' এমনি শত শত দৃষ্টান্তে রীতিমতো দৃষ্টিযোগ্য সজীবতা।

এর পাশাপাশি সত্যিকারের সাংগীতিক প্রেরণায় উচ্চকিত একটি ধারাও রয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। লোক-গাথা অন্তর্গত গান নামক রচনাগুলোকে এর থেকে বাদ দিতে চাই, কারণ, তারা আসলেই বিভিন্ন ধরনের গীতিকা। আধুনিক পূর্ব-বাংলা সাহিত্যে ঐ ধরনের আদর্শ দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব কাবিতা; 'রজনী শাঙন ঘন ঘনদেয়া গরজন রিমিঝিমি শবদে বরিষে, পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে' এর সমগ্র পরিমণ্ডলটা এক অমোঘ চিত্রের মধ্যেই নিমজ্জিত; কিন্তু তা সত্ত্বেও এ এক অন্ধকার বিজলিবর্ষণের মায়াঘেরা কাব্যসংগীত ছাড়া কিছু না। চিত্র এখানেও আছে, তবে পটভূমিকায়, তাকে ছাড়িয়ে উঠেছে সুরময় আত্মার শিখা।

আধনিক গীতিকবিতা বলে যা পরিচিত তা এই ধারারই সার্থক পরিণতি বললে বোধ হয় ভুল হবে না। প্রাচীনে ছিল মানবীয় রূপকে ভগবৎ প্রেমের আবেগ, আর আধুনিক লিরিকে ব্যক্তির মুক্তি ও আত্ম-বিস্তারের কামনা। এরই নাম রোমান্টিসিজম, যা পাশ্চাত্যে জন্ম নিলেও আস্তে-ধীরে দুনিয়ার অগ্রসরমান সকল জাতির মানসকে অল্পবিস্তর শিহরিত করেছে। ক্লাসিকের সুমিতি, সৌকর্য ও মূর্ত অবয়বে চিত্রগুণ সহজেই অবস্থিত, কিন্তু রোমান্টিকের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলায় সাংগীতিক কম্পনেরই প্রাধান্য। মেঘনাদবধ কাব্যে এ-দুয়ের সংঘর্ষজনিত বৈপরীত্য (contrast) স্পষ্ট। মধুসূদন সজ্ঞানে মহাকাব্য লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কালের অনিবার্য চঞ্চল প্রবাহে যে তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত তা জানতে পারেননি; বা জানলেও প্রচণ্ড যশোলিপ্সার দরুন তাকে আমল দেননি। কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই এমন প্রতারণার নজির নেই; কাব্যের মালায় এ নকল মুক্তা, এবং নকলও যে খাঁটির মতো দামী বলে স্বীকৃত তার কারণ রচয়িতার শক্তি নয় বরং পরিকল্পনা-প্রণয়নে শক্তির ব্যর্থতা; তার মানে, গায়ের জোরে তিনি কেবল কাঠামোটাকেই ঠিক রাখতে পেরেছেন, কিন্তু যে জন্য পাংক্তেয় তা হল এই কাব্যের এক অভিনব সাংগীতিক ধ্বনি যা মধ্যযুগের প্রথাসর্বস্ব কাব্য ও সংস্কৃত-রীতির কৃত্রিমতা থেকে ঐতিহাসিক

উত্তরণ। রেনেসাঁর আলো রক্তপ্রবাহের মতোই কাজ করেছে, অমিত্রাক্ষর যেন তারই নাড়িস্পন্দন এবং তার ফলে কৃত্রিম প্যাটার্নের, তলে তলে যে জটিল-গঠন সংগীতের সৃষ্টি হয়েছে, রাবণ মেঘনাদ বীরবাহু বিভীষণ রাম লক্ষণের মতো জবরদস্ত চরিত্র ও স্বর্গ-মর্ত্য পাতালের বিবৃতি থাকলেও, এই গাথাটি, আমার মতে, এখনো পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিমূর্ত কাব্য।

যাই হোক, রোমান্টিসিজমের ইতিহাস এই প্রমাণ করে যে, নূতন কোনো আলোড়ন বা ভাবনার জোয়ার জন্ম নিলে কোন শিল্পই তখন উদাসীন থাকতে পারে না; কারণ সে তো মূলত মানস-কুসুমই। উল্লেখিতের মতো, বলাবাহুল্য ইম্প্রেসনিজম কিউবিজম সুররিয়্যালিজম দাদাইম ফিউচারিজম কি সাম্প্রতিক একজিস্টেন্সিয়্যালিজম-এর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মূলত চিত্রকলার রূপা-দর্শের নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেই এগুলোর জন্ম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এরা কবিতা ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকে সম্মোহিত করতে ছাড়েনি। জীবন যেখানে প্রচণ্ড শিল্পকলাও সেখানে অস্থির হতে বাধ্য; এবং সেখানে এলুয়ারের সঙ্গে পিকাসোর অহি-নকুলের স ম্ব নেই। এখানে স্তালিনোভস্কি যেমন এসে খাতির জমাতে পারেন তেমনি আনা পাবলোভাও সহজেই বরণীয়া এবং বলাবাহুল্য আন্না মানিয়ানিও অনাদৃতা নয়। আসল সমস্যা হল সৃষ্টি, কিভাবে কি মাল-মশলায় সম্ভব হল সে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে খুব অল্প লোকই রাজি। আর সৃষ্টি সর্বদাই অপূর্ব বস্তু হলেও অলৌকিক নয়, বরং সামঞ্জস্যপরায়ণ।

তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা জিনিসটাই খানিকটা কৃত্রিম, এবং অনিশ্চয়তার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। কৃত্রিম এজন্য যে, তাতে থাকে ঐতিহ্যের ঊর্ধ্বে ওঠবার একটা সচেতন প্রয়াস, এবং অনিশ্চিত, কেননা তা নতুন ধাপ সৃষ্টি করতে পারবে কি না আগে থেকে তা বলা মুশকিল। অথচ ইতিহাসের এক পর্যায়ে একে বাদও দেওয়া যায় না। সেজন্য যুগসন্ধিকালের শিল্পীদের ব্যর্থতাই যেন তাদের বিধিলিপি। তারা যেন সেই কৃষক, সেই জমি চাষ করে বীজ বুনে মরে যায় কিন্তু ফসল তোলে তার সন্ততিরা। বনেদী রীতিকে ভাঙবার জন্যই উপরোক্ত প্রয়াসগুলোর উদ্ভব, প্রত্যেকটি দল বেশ তুখোড়ও ছিল বটে, কিন্তু তারাও প্রাকৃতিক নিয়মকে উপেক্ষা করতে পারেননি; অর্থাৎ, বিভিন্ন আংগিকে যারাই খানিকটা সাফল্যলাভ করেছেন তাদেরকে

মোটামুটি সেই শিল্পাদর্শের বাঁধা-সড়কেই চলতে হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফরাসি সুররিয়ালিস্টরা উল্লেখযোগ্য। কাগজে-কলমে মেনিফেস্টো মানলেও গোষ্ঠীর বাইরে গিয়ে স্বাধীন প্রকাশের পথেই জিদ কি আরাঁগ সার্থক হয়েছেন। আধুনিক অস্তিত্ববাদী সার্ত্রে কি কামু্য সম্বন্ধেও কি একথা বলা যায় না?

এর কারণ সাহিত্যের মধ্যে শিল্পরীতির আন্দোলনমূলক প্রভাবের স্বাভাবিক অকার্যকারিতা। সাহিত্য ভাষাশিল্প এবং তার আবেদন অধিকতর পরিমাণে লোকমুখী বলেই একদিকে সে যেমন জাতীয় ভাষার বহমান পরিণতিকে বর্জন করতে পারে না, তেমনি এ-কারণেই একান্ত উদ্ভট হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। চিত্রকলায় কিউবিজম সহজেই স্থিত, কেননা রমণীয় ভাবে বিন্যস্ত বর্ণক্ষেত্রের এমন একটা চাক্ষুষ রূপ আছে, যা পরিপূর্ণ দুর্বোধ্যতা নিয়েও আকর্ষণীয় হতে পারে। কিন্তু কবিতাকে যদি করে তুলি কেবল একটা সুশৃংখল শব্দক্ষেত্র, যাতে থাকবে না নির্দিষ্ট বা সরলরেখায় উৎকীর্ণ কোনো আবেগ, কল্পনা বা অর্থের দায়? সাহিত্যের ইতিহাসে কিউবিস্ট কবিতা কি মর্যাদা পাবে সে অবশ্যি বর্তমানকালে অনির্ণেয়, তবু একথা বোধ হয় বলা যায় যে, যেগুলো সার্থক কবিতা তাতে এমন কিছু থাকবে যার শিল্পগুণ আবেদনগ্রাহ্য। সে হয়তো শুধু প্যাটার্ণটুকু, নয় কয়টি তপ্ত শব্দকণা, নয় কিছু চিত্রকল্প, অথবা পদবন্ধের অবয়ব।

অবশেষে এই বলতে চাই যে, শিল্পী দ্বিতীয় স্রষ্টা বলেই তাকে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্যই মিশ্রমানব হওয়া বাঞ্ছনীয়; পুরাকালের রাজপুত্রের মতো সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হতে পারলে তারই লাভ, বিশেষ করে ললিতকলার প্রকরণগুলো তার গভীরভাবে জানা চাই। দা ভিঞ্চি গ্যেটে কি রবীন্দ্রনাথ সবাই না হতে পারলেও সকলের সাধনার রীতিটা একই। সংগীত নৃত্য চিত্রকলা ভাস্কর্য সম্বন্ধে কোন লেখকের জ্ঞান থাকলে এগুলো তার রচনাকে নতুন নতুন বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত করতেও পারে। এবং প্রত্যেক জীবন্ত লেখকই তো অক্লান্ত নিরীক্ষক। নানা প্রকরণ ও রীতি অস্থিমজ্জায় ধারণ করতে পারলেই নতুন রীতির জন্ম দেওয়া সম্ভব। এবং এরই নাম বুঝি আলো দিয়ে আলো জ্বালা?

১৯৬৩

যেহেতু শিশুসাহিত্য একটা দেশের গোটা সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডেরই অংশ, সেজন্য এর রচনা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত সমস্যাকে সাহিত্যের সাধারণ সমস্যা থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। এক বাগান নানা লতাগুচ্ছ, নানাফুল, এক হাওয়ার ছোঁয়ায় তারা হিল্লোলিত হবে সেই স্বাভাবিক। তবু দু'য়ের পার্থক্যটুকুও মনে রাখা দরকার। পরিণত মানুষের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য মলতই জীবনশিল্প, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়রত আত্মার নানা শিহরণের রূপায়ণই এখানে মুখ্য। কিন্তু শিশুসাহিত্য, শিশুদের দ্বারা কিংবা শিশুদের জন্য, যেভাবেই রচিত হোক, তা নয়। তার স্বতন্ত্র চরিত্রের প্রধান বিশিষ্টতা হল এই যে, আবেগ ও মননের বদলে কল্পনার এক আশ্চর্য জগৎ গড়ে তুলতেই সে তৎপর। কাজেই সে আত্মব্যবচ্ছেদধর্মী নয়, বরং ঘটনামুখিন। আদি যুগের উপন্যাস বলে কথিত ডন কুইকসোট রবিনসন ক্রুসো কি গালিভারস ট্র্যাভেল কেন শিশুপাঠ্য বইও বটে, এখানে তার কারণ মিলতে পারে।

তবু এতেই শেষ নয়। আলোচনার সুবিধের খাতিরে শিশুদের জন্য লেখা রচনাবলীকে তিনটি ভাগে সাজিয়ে নিতে চাই। প্রথম শিক্ষাধর্মী, দ্বিতীয় বিজ্ঞানমূলক এবং তৃতীয় কল্পনাশ্রয়ী।

দ্বিতীয়, পর্যায়ের রচনার অনেক প্রথমে এসে পড়লেও পৃথক করেছি স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য। এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তা বিরাট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারে তাতেও সন্দেহ নেই। শিশু ভবিষ্যৎ জাতি এই সত্যের মধ্যে তাদের নিয়ে সব প্রচেষ্টার সারমর্ম নিহিত। সেই ভবিষ্যৎ সুন্দর হোক এইতো সকলের কাম্য। তাহলে লক্ষ্য নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। এর আদর্শ সম্বন্ধে, প্লেটোর আমল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত পণ্ডিত ও ভাবুকেরা যাই বলুন, আমি কোনো নির্দিষ্ট নীতিশাস্ত্রের প্রতি

ইঙ্গিত করছি না, বরং আমার পক্ষপাত এমন এক সজীব সমাজব্যবস্থার প্রতি, যেখানে প্রত্যেকটি বালক-বালিকা তার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা বিকাশের অবাধ সুযোগ পাবে। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাই সেই প্রতিবেশের মূলমন্ত্র এবং তার একটা জাতিগত রূপ থাকতে পারে কিন্তু আন্তর্জাতিক মানবতার দিকেই তার অনিবার্য গতি।

আজকের শিশুকে এক অখণ্ড সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্বসূরী হিসেবে গড়ে তোলবার জন্য যুগে যুগে মনীষীরা চিন্তা করেছেন। প্লেটো শিশুদেরকে করতে চেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, কারণ তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে তারা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করার উপযুক্ত হয়ে ওঠে এবং এটা জনক-জননীর দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। শ যে বলতেন নারীপুরুষ অন্ধকার ঘরে মিলিত হোক এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, তাহলে শিশু মাতা-পিতার পরিচয় জানবে না; ফলে গোড়া থেকেই সে হবে মুক্ত মানুষ। এখন টেস্টটিউব শিশু তো উৎপন্ন হচ্ছেই, কিছুকাল পরে এমন স্তরও আসতে পারে যখন দাম্পত্য জীবন থাকলেও শিশুর জন্য সকল উদ্বেগের ঘটবে পরিসমাপ্তি। কারণ তখন ম্যাটারনিটি হোমের বদলে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে চাইল্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং ল্যাবরেটরী গড়ে উঠবে!

আমাদের প্রার্থনা, সেইদিন বিলম্বিত হোক। নারীকে মাতৃত্বের গৌরব থেকে বঞ্চিত দেখতে আমরা ইচ্ছা করিনে, নর-নারীর প্রেমকে শিশুপুষ্পে অঙ্কুরিত হতে দেখতে আমরা অভিলাষী। আগামীকালের শিশু যেন মাকে ডেকে শুধাতে পারে, এলেম আমি কোথা থেকে, কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে। আর মা তা শুনে, হেসে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে বলতে পারে, ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।। যৌবনেতে যখন হিয়া উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে ।।

তার মনে রাখতে হবে যাকে ভালবাসা যায় তার প্রতি দায়িত্ব সব-চেয়ে বেশী। বিশেষ করে সে যখন মানব-উপকরণ। জীবের উত্তরাধিকার বিশ্লেষণে মেণ্ডেল ও মর্গানের আবিষ্কার যুগান্তকারী, পিতামাতার গুণাবলী পরবর্তী পুরুষের ওপর, সে যথেষ্ট দূরে হলেও খানিকটা বর্তায় এ তাদেরই

এক সিদ্ধান্ত। পরবর্তী গবেষণার ফলে এর আরো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক উন্মোচিত হয়েছে ; বংশগতির প্রভাবটাই চরম নয়, পাভলভের বিচারে দেখা যায় জীবের আচরণে তার পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যই বরং মুখ্য, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা। এবং এই পরিবেশ বিজ্ঞান বা মানবীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন। আমি এই তত্ত্বগত পটভূমিকে স্মরণ করেছি এইজন্য যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এতকাল এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে যা মনুষ্যত্বের নির্বাধ বিকাশের পরিপন্থী, বরং একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টির দিকেই যেন নজর। চাষীর ছেলে মজুরের ছেলে যেন চাষী মজুর হওয়ার জন্যই জন্মেছে, এবং শাসকের ছেলে হবে শাসক। জাতিকে এইভাবে পৃথক করার ফল বিষময় হতে বাধ্য। ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি যেখানে অন্তত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা উচিত ছিল, সেখানে বরাবর শিক্ষা সংকোচনের নীতিই অনুসৃত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে গুণগত উৎকর্ষ বিধানই নাকি লক্ষ্য। কিন্তু এটা কোনো যুক্তি না অজুহাত? শতকরা দশজন যেখানে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে সেখানে নির্বাচন করব কি? একশ'জনকে শিক্ষা দাও, তখন মন্দ থেকে ভালোকে বেছে নিতে আমি রাজী। শুধু তাই নয়, শিক্ষাপদ্ধতিও আমলাতান্ত্রিক মনোভাব থেকে রেহাই পায়নি। প্রাথমিক স্তরেই চার-চারটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা যে কোন্ বুদ্ধির পরিচয় সে আমার কাছে দুর্বোধ্য। দুনিয়ার সকল দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম মাতৃভাষা। কিন্তু এখানে আমরা মাতৃভাষার সঙ্গে আরো তিনটি ভাষা যোগ করেছি। ইংরেজী আরবী আর উর্দু। যে অবস্থায় ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশটাই শুধু কাম্য, তখন তাদের মস্তিষ্কের উপর এমন ধোপার গাধার বোঝা চাপাবার কি মানে থাকতে পারে, অন্যভাষা শিক্ষা নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু তার একটা সময় আছে, এবং সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে সেগুলো শিখতেই হবে এমনও কোনো কথা নেই।

যাই হোক, আপাতত যা আছে তাই আমাদের অবলম্বন। এইস্তরে মাতৃভাষা প্রয়োগের যতটুকু সুযোগ আছে তার সবটার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করাই হবে আমাদের কর্তব্য। তার মানে শিশুদের জন্য শিক্ষাধর্মী বই রচনায় সৃষ্টিশীল লেখকদের অগ্রণী হওয়া দরকার। কতকগুলো বই থাকবে অক্ষর ও ভাষা পরিচয়মূলক আর কতকগুলো তথ্যনির্ভর, দু'ক্ষেত্রেই রচনা

চিত্তাকর্ষক হওয়াই চাই। এসব বই লেখার পদ্ধতি কি হবে রুশো ফ্রোএবেল মন্তেসরী রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিক্ষা-প্রবর্ত্তক মনীষীদের রচনাবলী থেকে যথেষ্ট নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে। সরাসরি পাঠ্য ও পাঠ্যের অনুষঙ্গী, প্রত্যেকটি বইয়ের পরিকল্পনায়, আমার মনে হয়, আরো একটি দিকের প্রতি জোর দেওয়া প্রয়োজন, সে হল কারিগরি জ্ঞান। আমাদের শিক্ষা মূলত পুথিকেন্দ্রিক। কিন্তু পুথিকেন্দ্রিক শিক্ষা নিজ স্বভাবেই সংকীর্ণ, তাতে কেরানী সৃষ্টি হতে পারে, মানুষ নয়। ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে হাতে কলমে যা শিখতে পায়না, বইয়ের ছবি ও গল্পের মাধ্যমে তার প্রতি একটা কৌতূহল জাগাতে পারলেও লাভ।

এরপর আমি এমন একটি বিষয়ের উল্লেখ করব, যা শিশুদের জন্য পাঠ্যবই রচনার স্বাধীন উদ্যোগের পক্ষে প্রধান বাধা। সে হল পাঠ্যবই রচনা ও প্রকাশনার ওপর টেক্সট বুক বোর্ডের সর্বময় কর্তৃত্ব। টেক্সট বুক বোর্ড গঠন করে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনায় একটা সাধারণ উন্নত মান সৃষ্টি করাই বোধ হয় ছিল সরকারের উদ্দেশ্য, আর তা একদম সফল হয়নি এমন কথা বলা যায়না, কারণ বোর্ড প্রত্যেকটি বই যোগ্য লেখক ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লেখাবার চেষ্টা করেন এবং প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের সেগুলো ছেপে বার করার দায়িত্ব দেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বইয়ের ঈপ্সিত মানটি অর্জন করা যেন সম্ভব হচ্ছে না। অনেক বই সম্পর্কে শিক্ষক অভিভাবক ও বিভিন্ন মহলের বিরূপ সমালোচনাই তার প্রমাণ। আমার মনে হয়, এই দুর্বলতার একটি প্রধান কারণ অবাধ প্রতিযোগিতার অভাব। বই রচনা ও বইয়ের ব্যবসায়ে মনোপলি গ্রহণের ফলে, যাদেরকে চুক্তি দেওয়া হয়, সেই প্রকাশকেরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন না, কারণ তাদের বিবেচনায় তাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ হয়তো অকিঞ্চিৎকর। এই অবস্থায় বাইরের লেখক, যারা নিঃসন্দেহে সংখ্যাগরিষ্ঠ, বই লেখার সুযোগ পান না, সেজন্য অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবেশ থাকলে যা হত, সেই বহুবিচিত্র লিখনভঙ্গী ও উদ্যোগের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এবং সাধারণভাবে পুস্তক ব্যবসায়েরও হয়েছে যথেষ্ট ক্ষতি। পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব সরাসরি না নিয়ে, অন্যান্য দেশের মতো, বোর্ড যদি বিভিন্ন বিষয়েরই বই পরীক্ষার বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করতেন, এবং বই রচনা ও প্রকাশনার ব্যাপারটি অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে দিতেন, তাহলে

অবস্থার আরো অনেক উন্নতি হতো বলে ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা। তাতে বইলেখা ও বইয়ের ব্যবসা, দু'ক্ষেত্রেই রক্তের সঞ্চার হত, ভালো জিনিস গৃহীত হত আর মন্দ জিনিস হত বর্জিত। কিন্তু বর্তমানে ভালো মন্দ যাচাই করবার কোনো সুযোগই নেই।

দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাগুলোকে আমি বলেছি বিজ্ঞানমূলক। বৈজ্ঞানিক বিষয় পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার বিস্তার সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিষয়গুলোকে ছুঁয়ে যাওয়া মাত্র, কাজেই অনুবর্তী বইয়ের আবশ্যিকতা। এই বইগুলোর অন্তত দু'টি শ্রেণী থাকবে, সে হল কারিগরি তত্ত্ব ও ইতিহাস এবং সংস্কৃতি। প্রথম শ্রেণীর বইগুলোর উদ্দেশ্য একদিকে যেমন গল্পের ভঙ্গিতে মনোরমভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ইতিহাসের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচয় ঘটানো, তেমনি অন্যদিকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কারিগরি দিকটি সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলা। জাতিকে বিজ্ঞান-মনা করতে না পারলে আজকের দুনিয়ায় টিকে থাকাই অসম্ভব, অথচ গত পনেরো বছরে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য কিছুই করতে পারিনি, এ সত্যই দুঃখজনক। এক্ষেত্রে একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান কিছু তর্জমার কাজ করে আমাদের লজ্জা দিয়েছেন। নিজের ভাণ্ডার শূন্য বলে বাইরের জিনিস এসে কিছুটা চাহিদা মিটিয়েছে, হাঁ আমি পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান-বিচিত্রা ও জানবার কথা গ্রন্থমালার কথাই বলছি। ওদেশের দেশ-প্রেমিক তরুণ বৈজ্ঞানিকদের এটা প্রশংসনীয় উদ্যম। এছাড়া ওদের আরো রয়েছে হাজারো রকম বই। শিশুভারতী সেগুলোর একটি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও কারিগরির প্রায় সব কটি বিষয় প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থমালার অধীন হতে পারে: যেমন পদার্থবিদ্যা রসায়ন জীবতত্ত্ব উদ্ভিদবিদ্যা ভূতত্ত্ব জ্যোতি-র্বিদ্যা জ্যামিতি গণিত বিদ্যুৎ ও যন্ত্রের বিভিন্ন কারিগরি দিক, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বইগুলোতে: সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা নৃত্য স্থাপত্য ভাস্কর্য ইতিহাস দর্শন রাষ্ট্রনীতি অর্থশাস্ত্র অভিযান ভ্রমণ আবিষ্কার মহাশূন্য জাতিসংঘ। যা মনে এল সেভাবে উল্লেখ করে গেলাম। সকলে মিলে চিন্তা করলে এমন একটি সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা রচনা সম্ভব, যা কার্যে প্রয়োগ করলে আমাদের ছেলে-মেয়েদের মাতৃভাষার মাধ্যমে একটা সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি দিতে পারব। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন। এই সম্মেলনে আমি প্রস্তাব করছি যে, প্রতিষ্ঠানের নাম হোক

জাতীয় শিশু সাহিত্য সংসদ। এই প্রতিষ্ঠান যদি কোনদিন গঠিত হয়, তাহলে অন্যদের সঙ্গে আমি আমার এতদ্‌সংক্রান্ত বিস্তারিত চিন্তাধারা সানন্দে যোগ করব। বাংলা একাডেমীও শিশু সাহিত্য বিভাগ খুলে এই দায়িত্ব অন্তত আংশিক পালন করতে পারেন।

তৃতীয় পর্যায়ের রচনা কল্পনাশ্রয়ী। ছোটগল্প কবিতা ছড়া নাটক নাটিকা উপন্যাস কাল্পনিক অভিযান ও ভ্রমণ কাহিনী রূপকথা উপকথা গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প এর অন্তর্গত। গোড়াতেই বলেছি, এদের অধিকাংশ পুরোপুরি শিল্প হয়ে উঠতে পারে না, কারণ শিশুর সদ্যজাগা কৌতূহলের নিবৃত্তি ও তার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করাই এদের মূল লক্ষ্য; দুনিয়ার বহু রচনা যে সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে তার কারণ কল্পনা ও শিল্পের উপকরণ এবং ওসব রচনার আঙ্গিকগত সিদ্ধি। হ্যান্স এণ্ডারসন অসকার ওয়াইল্ড মার্ক টোয়েন ও জুলে ভার্নের গল্প বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কবিতায় বাংলাদেশে সুকুমার রায়ের সাফল্য রীতিমতো অতুলনীয়। ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশের সহায়ক বলে এই ধরনের সৃষ্টিমূলক রচনাগুলোর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। এই বিভাগে আমাদের কিছু কবি এগিয়ে এসেছেন এটা আশার কথা। গত কয় বছরে অনেক ভালো লেখা তাদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। কবিতা ও ছড়ায় হোসনেআরা, আহসান হাবীব, আশরাফ সিদ্দিকী ও ফয়েজ আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। আবদুর রহমানের টুটুর হাওয়াই সফর একটি সুপাঠ্য রচনা। অনেক কিশোর লেখকও ভালো লিখছেন। শওকত ওসমানের নাটক এতিমখানা ও উপন্যাস তারা দুইজন চলনসই, শামসুদ্দীন আবুল কালামের কাকলিমুখরও তাই। আতোয়ার রহমানের সাঁঝের বেলার রূপকথা ও হাবিবুর রহমানের বিজন বনের রাজকন্যা বই দু'খানা বাংলা রূপকথার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মূল্যবান সংযোজন।

কবিতায় খানিকটা সমৃদ্ধ হলেও কথাসাহিত্য ও নাটকের দিক দিয়ে এই বিভাগটা বেশ দুর্বল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। 'আলাপনী' 'খেলাঘর' কিংবা সংবাদপত্রে ছোটদের মজলিশগুলোতে গল্প কম ছাপা হচ্ছেনা। কিন্তু বেশীর ভাগ লেখার নিম্নমান পীড়াদায়ক। যেন-তেন প্রকারেন একটি গল্প বলে যাওয়াই যেন লেখকের উদ্দেশ্য থাকে; এত ব্যস্ততা, সময় নেই লেখাকে শিল্পসুষমামণ্ডিত করার। বাচ্চা লেখকদের

বড়রা মোটেই সাহায্য করেন না সত্য। এটা এক গুরুতর দিক, কারণ এই সহানুভূতিহীনতার দরুন পূর্বসূরীদের প্রতি একটা বদ্ধমূল অশ্রদ্ধা নিয়ে তারা বাড়তে থাকে, যা সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর। আর বড়দের লেখার মধ্যেও যেন একটা উদ্দেশ্যহীনতা ও নৈরাজ্য, তারা যে সাধনা করছেন না তা অত্যন্ত প্রকট। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মানসিক উন্নয়নের জন্য নাটক এক অপরিহার্য উদ্যোগ, কিন্তু এখানেও একই অবস্থা। বিগত পনেরো বছরে এমনকি প্রাদেশিক রাজধানীতেও আমরা একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলতে পারিনি, আর শিশুদের জন্য আলাদা রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থার কথা বলা তো বাতুলতা। কিন্তু আসল কথা হল, বয়স্কদের জন্য হোক বা না হোক, ছোটদের জন্য অবিলম্বে রঙ্গমঞ্চ চাই। এই চিন্তা একবার আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, আমি শিশু রংমহল নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, সারাদেশে এর কয়েকটি শাখাও হয়েছিল, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বর্তমানে উৎসাহ অনেকটা মিইয়ে এসেছে। লাভের মধ্যে লাভ একটি রচনা—'মরক্কোর জাদকর'।

এতক্ষণে হয়তো বলা যায় শিশুসাহিত্য রচনা ও প্রকাশনা পরিস্থিতি আমাদের এখানে মোটেই আশাপ্রদ নয়। প্রথমে যে উল্লেখ করেছিলাম এখন সে সাধারণ সমস্যার আলোচনার দিকে যেতে পারি। সে সাধারণ সমস্যা হল, গোটা জাতীয় জীবনেরই প্রগতিহীনতা, সংকট ও বন্ধ্যাত্ব। এমনকি ক্রম অবক্ষয় দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এর ফল সাংস্কৃতিক নিশ্চলতা, সাহিত্যও যার অঙ্গীভূত। রোদেপোড়া রুক্ষ মাটিতে ফুল ফোটেনা ফসল ফলে না। যদি কিছু ফোটে বুঝতে হবে সে ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রম তো বিধি নয়। যে অবস্থায় জাতীয় মনের পরিণতি (maturity) জন্ম নিতে পারে তার প্রাথমিক ভিত্তিও এতদিনে রচিত হলনা, আমরা পিছনে পড়ে থাকবো না কেন? এতদ্সত্ত্বেও শিশু সাহিত্যের প্রতি নিছক ভালোবাসার দরুন ব্যক্তিগত উদ্যোগে যা হয়েছে, তা আমাদের প্রাণ-শক্তিরই পরিচায়ক। এদেশের শ্যামল প্রকৃতি উর্বর মাটি ও ঋতুর লীলা বৈচিত্র্য লোকচরিত্রকে সকল অবস্থাতেই সংগ্রামী ও ভাবুক করে তোলে, এ বোধহয় তারই ফল। সেজন্য শিক্ষিত শ্রেণীর মতো লেখকরাও, নিছক জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় পরগাছা হওয়া সত্ত্বেও একেবারে মরে না রোগশয্যায়ও তারা ঠিক বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

বলতে চাই, সাহিত্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দরকার, কিন্তু তারও চেয়ে বেশি প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি। সে পরিবেশ মানে পূর্ণ গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। এবং এগুলোর সঙ্গে সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার। প্রত্যেকটি ব্যক্তিই যখন জীবনের বহুবিচিত্র দিকের অবাধ সুযোগে নিহিত তখন সে প্রাণচঞ্চল ও কর্মমুখর হবেই, তখন সেমিনার সম্মেলন আহ্বান করে সাহিত্য লেখার উপায় উদ্ভাবন করতে হবেনা, কারণ আত্মপ্রকাশটাই হবে তখন সাধারণ ধর্ম। সেই পরিবেশকে সম্ভব করে তোলাই আমাদের আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেজন্য দরকার কুসংস্কার ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, এবং সাধনা। আমাদের জাগতে হবে, বাঁচতে হবে, বাড়তে হবে। আপাতত, অন্তত শিশু সাহিত্যের ব্যাপারে আমরা একটা সংস্থা গঠন করতে পারি, যার থাকবে দ্বিমুখী কর্মধারা, এক, সরকারকে উদ্যোগশীল করা এবং দুই, বাইরে প্রাপ্ত উপকরণসমূহকে একত্রিত করে এগিয়ে যাওয়া। সেরা লেখার ওপর বাৎসরিক পুরস্কার প্রদান ছাড়াও সরকার তার নিয়ন্ত্রণাধীন ইস্কুল কলেজ পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য প্রত্যেকটি বইয়ের একটি নির্দিষ্ট কোটা, যেমন এক হাজার কপি, বাধ্যতামূলকভাবে কিনে লেখকদের উৎসাহিত করতে পারেন। এই পোষকতা পরোক্ষ, তবু এটাই সবচেয়ে ফলপ্রদ। দ্বিতীয়, সরকারী সাহায্যের আশ্বাস পেলে আমরা একটি শিশু বিশ্বকোষ প্রণয়নে হাত দিতে পারি। তৃতীয়ত, ব্যাপক ভিত্তিতে একটি বার্ষিক জাতীয় শিশুমেলার ব্যবস্থা করা যায়, চতুর্থত, অন্তত ঢাকায় অবিলম্বে একটি যাদুঘর কাম রম্যউদ্যান জাতীয় শিশুনগরিকা তৈরী করবার জন্য আমরা সরকারকে চাপ দিতে পারি। সে হবে ডিজনিল্যাণ্ডের চাইতেও সম্পূর্ণ, কারণ খেলাধূলা ও সর্ববিধ উপকরণের মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতি মানব-সমাজ পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতার সঙ্গে ছোটদের পরিচয় ঘটানো হবে এর অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এসবকে কার্যকরী করার জন্য উৎসাহী নাগরিকদের একটি কর্মপন্থায় সম্মিলিত হতে হবে, তা বলাই বাহুল্য।

সবশেষে নিবেদন, এ প্রবন্ধে আমি উত্তমপুরুষে অনেক কথা পেশ করেছি, এ আমার অহঙ্কার নয়, বলবার ভঙ্গি মাত্র। তবু যদি কারুর মনে খটকা থাকে তাদের কাছে ক্ষমা চাই।

১৯৬২

আধুনিক জার্মান কবিতা

জার্মেনী নামটা আমাদের লোকসাধারণের কানে যে প্রায় রূপকথার ঝংকার নিয়ে বাজে তার কারণ পর-পর দু'টি মহাযুদ্ধের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা। এই পরিচয় বিপর্যয়ের, আবিষ্কারের নয়, সেজন্য এখানে বীরত্বের বিস্ময়বোধ থাকলেও বিমূঢ়তার ব্যঞ্জনাই অধিক।

কিন্তু এতবড় দু'টো আলোড়নের নায়ক যে জাতি তার সম্পর্কে এদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ কেন নিস্পৃহ সে জিজ্ঞাসা স্বতন্ত্র। আমরা দুনিয়াকে দেখেছি, পেয়েছি ইংরেজীর বাতায়নে, এবং সে গবাক্ষের দৃশ্য চতুর্দিকে বিস্তৃত হলেও তার মধ্য দিয়ে সবকিছুর পরিচয় ও স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, পরাধীনতার অভিশাপে ব্যক্তিসাধনা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন—উভয় দিক থেকেই আমরা সীমাবদ্ধ ছিলাম। সেজন্য অন্যতর ভাষার অনুশীলনে আমাদের বৈচিত্র্যবোধ ও সমৃদ্ধির পরিচয় নেই। আবার অন্যভাষা চর্চা অনেকাংশে বিফল হতে বাধ্য যদি হয় তা একান্ত ব্যক্তি-গত; দূরের পুষ্পোদ্যান থেকে কিছু ফুল কিছু ফল কিছু পাতা চয়ন করে এনে প্রিয়জনদের উপহার দিতে না পারলে অন্যবাগানে যাওয়ার সার্থকতা কোথায়!

বিজ্ঞানের, বিস্ময়কর বিস্ফোরণে আজ আমরা যারা পৃথিবীর নৈকট্যে-গ্রথিত, তেমনি বিভিন্ন মানবমণ্ডলীর পারস্পরিক পরিচয়ের প্রয়াসেও নতুন নতুন সম্ভাবনার দরোজা খুলে যেতে বাধ্য। বলা বাহুল্য সাহিত্য চিত্রকলা সঙ্গীত নৃত্য চলচ্চিত্র সেই মহামানবিক আত্মীয়তার প্রধান সূত্র।

আধুনিক জার্মান কবিতা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ এই মহান আনন্দ-বোধ ও কর্তব্য চেতনারই সামান্য অভিজ্ঞান।

জার্মান সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি বিষম ছন্দ লক্ষ্য করা যায়: আঠারো শতকের সপ্তমদশকে ঝড় ও জোর (sturm and

Drang) আন্দোলন, উনিশ শতকের তিরিশে তরুণ জার্মেনী ও আশিতে প্রকৃতিবাদ বিশ শতকের কুড়িতে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর প্রকাশবাদ—এ সমস্তেই পুরনোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ, এবং প্রত্যেকবারেই যেন নতুন একেকটা মৌসুমের আয়োজন। সেজন্য, ভেকেরলিন ওপির্য ক্লপস্টক গ্যেটে হেল্ডারলিন রিলকে ট্রাক্ল এঁরা প্রত্যেকেই যেন নতুন করে তার বেঁধেছেন। সুর সেধেছেন।

আধুনিক জার্মান কবিতা বলতে আমরা প্রথম মহাযুদ্ধের স্বল্প পূর্ববর্তী কাল থেকে শুরু করে দুই মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রবহমান সেই কবিতাধারাকেই বুঝি যা ভাষায় ও প্রকরণে পরীক্ষাধর্মী, উৎকেন্দ্রিক ও জটিলতা সমন্বিত এবং বিষয়ে বর্তমান সভ্যতার শূন্যতা, নৈরাশ্য ও যন্ত্রণার অনিশ্চিতের দিকে আবর্তিত। পূর্ববর্তী কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেখানে বিশৃঙ্খলার চেয়ে সৌষম্যই মুখ্য; অপরপক্ষে এই আধুনিকতা আপন বৈশিষ্ট্যে মূর্তিমান। কবিতার এই প্রকৃতি আমাদের অপরিচিত নয়, কারণ আধুনিক অভিধার অঙ্গীভূত বাংলা কবিতার ধারাও কতকটা এইভাবেই বিচ্ছিন্ন।

যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত মানবীয় অভিজ্ঞতা জার্মান সাহিত্য নামে পরিচিত তা অবশ্য খুব বেশিকালের পুরাতন নয়, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে তার গঠনযুগের তথ্যেরও দাম আছে বৈকি। সে হিসেবে আদি জার্মান রচনা ৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের একটি রাজনৈতিক দলিল, নাম তার 'স্ট্র্যাসবুর্গ শপথ'। ফরাসী ও জার্মান দুই ভাষাতেই এই দলিলটি একই সময়ে লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তবে ফরাসী পাঠটি যেখানে খাঁটি ফরাসী লক্ষণযুক্ত আদিতম ফরাসী ভাষার নিদর্শন সেখানে জার্মান পাঠে রয়েছে অন্তত একশত বৎসরের সাহিত্যিক অনুশীলনের স্বাক্ষর। তাই ফরাসীর আগেই জার্মান সাহিত্যের উদ্ভব, কিন্তু ইংরেজী জার্মানের পূর্বসূরী। কারণ, বলা যেতে পারে, আজকের জার্মেনীর ভৌগোলিক এলাকার টিউটনিক উপজাতি-গুলোকে যাঁরা দীক্ষিত করেছিলেন তাঁরা ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মিশনারী সম্প্রদায় এবং এই দুই দেশের ভাষাতেই খ্রীষ্টপূর্ব মৌখিক সাহিত্য সংরক্ষিত হয়েছিল। জার্মেনীতে বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যের একটিমাত্র নিদর্শনেরই সন্ধান মেলে, তা হিলডেব্রাণ্ডেরলে উপাখ্যান। খণ্ডিত বিশৃঙ্খল রূপ,

বিকৃত বিমিশ্রিত উপভাষার আকৃতি নিয়েও এই কাব্য জার্মান সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এছাড়া আদি মধ্যযুগের জার্মান সাহিত্যের তাবৎ রচনা যাজকীয় ও ধর্মীয় নিবেদনমূলক যার বেশির ভাগই তরজমা।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের সাহিত্য পুষ্পিত হতে থাকে, এবং ফরাসী মধ্যযুগীয় লাতিনের পর সারা ইউরোপে সবচেয়ে প্রভাবশালী সাহিত্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

দ্বাদশ শতকে শিভাল্‌রীর আবির্ভাবে খাঁটি জার্মান গীতিকবিতার জন্ম; আর অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই এই ধারা যার মূলে ছিল প্রেম, তার বিচিত্র গতি: দয়িতের জন্য সুন্দরী রমণীর ব্যাকুলতা থেকে শুরু করে ফরাসী রীতির পরকীয়া পর্যন্ত, বৈদগ্ধে ও গভীরতায় দুর্বার হয়ে ওঠে, এবং এভাবেই নিখিল ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সর্বোচ্চ স্তরে সংযোগ ঘটে জার্মান সাহিত্যের।

এরপরে যুগসন্ধি, শিভালরী-আদর্শের অবক্ষয়ে বেনামী লোককবিতার প্রাদুর্ভাব, ষোড়শ শতকে যা রেনেসাঁসী প্রেরণা লাভ করেছে; কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, নবজাগরণ জার্মেনীকে বিশেষ আলোড়িত করতে পারেনি কারণ রিফরমেশনের মধ্যেই তৎকালীন জার্মান-মনীষা আচ্ছন্ন ছিল। এই সময়কার শ্রেষ্ঠ ফসল লুথারের অনুমোদিত বাইবেল: বিশৃঙ্খল জার্মান ভাষাকে তা গ্রন্থিবদ্ধ করেছে শুধু এজন্য নয়, বরং ইউরোপীয় সাহিত্যে জার্মেনীর যে সেরা উপহার সেই প্রোটেস্টাণ্ট স্তোত্রের উৎসও এই মহান গ্রন্থ। কিন্তু তবু স্বীকার করতে হবে যে, রিফরমেশন ও তিরিশ বছরের যুদ্ধ, বিচ্ছিন্ন কবিদের কৃতিত্ব সত্ত্বেও, জার্মান সাহিত্যকে প্রাদেশিক গণ্ডিতে সঙ্কুচিত করলো। জার্মেনীতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের এলিজাবেথীয় কিংবা অগাস্টান যুগের অনুরূপ কোনো বসন্ত আমরা দেখতে পাইনা।

সেজন্য জার্মান সাহিত্যে গ্যেটের আবির্ভাব এত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার সুদীর্ঘ সৃষ্টিশীল প্রতিভা জার্মান সাহিত্যের প্রত্যেকটি উত্তেজনার মোড়ে সক্রিয় ছিল। সারা মধ্যযুগ ধরে জার্মান সাহিত্য প্রাদেশিকতার রং ও আচ্ছাদন ঝেড়ে ফেলতে পারেনি, কিন্তু আঠারো শ' বত্রিশ সালে গ্যেটের মৃত্যুর সময়ে তা নিখিল ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্যমণি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলো এবং এই ব্যাপারে গ্যেটের ভূমিকাই প্রধান ও সুদূরপ্রসারী। গ্যেটে ও শিলারের দীর্ঘ বন্ধুত্বও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য,

উভয়ে যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ভাইমার জার্মেনীর সাহিত্যিক পীঠস্থান বলে বিবেচিত হয়েছিলো, যার নজির সেই দেশে এই প্রথম। বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জার্মান আধারে মানবীয় ব্যক্তিত্বের এক মহান উচ্চাদর্শের প্রকাশক—ইউরোপীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে এই হচ্ছে গ্যেটে ও শিলারের প্রধান অবদান।

ফ্রেডারিখ হ্যেলডারলিন গ্যেটে ও শিলারের ধ্রুপদীরীতি ও নোভ্যা-লিসের রোমান্টিকতার মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত যদিও তিনি পরবর্তীর সম-সায়িক। জীবিতকালে তিনি ছিলেন বিচ্ছিন্ন ও অবজ্ঞাত, স্টেফান গেয়র্গ তাঁকে পুনরাবিষ্কার করেন। তাঁর কবিতায় রয়েছে ব্লেক ও ইয়েট্সটের মতো প্রজ্ঞা ও সারল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য, এবং সেই সঙ্গে প্রতীকধর্মিতাও।

শতাব্দীর বাঁকে যে তিনজন কবির কাজ সবচেয়ে স্মরণীয় তাঁরা হলেন স্টেফান গেয়র্গ হুগো ফন হফমান্সথাল ও রাইনর মারিয়া রিলকে।

এক কথায় বলতে গেলে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার ছন্দ ও নন্দনতাত্ত্বিক প্রকৃতি এঁদের কবিতার প্রধান বিশেষত্ব, এবং তার অভ্রান্ত পরিচয় রয়েছে গেয়র্গের প্রথম কবিতা সংগ্রহে, হফমান্সথালের কবিতাবলী ও ক্ষুদ্রনাট্যে, এবং রিলকের সর্ববৈচিত্র্যের বিন্যাস-ক্ষমতায়।

সময় বয়ে গেলে পিছনে রেখে যায় তার একটি ছায়া, এই রহস্যটি যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে এই সময়কার কবিতা অধিকতর বোধগম্য হওয়ার সম্ভাবনা: ছায়াটি স্থানে দণ্ডায়মান থাকে, তবু স্থান তা'কে বিচ্ছিন্ন করে সময় থেকে, এবং এই হচ্ছে তার স্থায়িত্বের রক্ষাকবচ। উভয়ের মধ্যে সেতুনির্মাণের জন্য স্থানকে সময়ে ও সময়কে স্থানে রূপান্তরিত করার প্রকৃষ্ট উপায় সংখ্যার ব্যবহার। গেয়র্গের প্রথম কবিতা সংগ্রহ এই সংখ্যা নিয়মের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

গেয়র্গ বোদলেয়রের লে ফ্লুর দু'মাল তরজমা করেছিলেন এবং খাঁটি কাব্যিক প্রকাশের আদর্শে ছিলেন মার্লামের কাছাকাছি, সেজন্য তুচ্ছ-ভাষা ও খেলো শব্দাবলীর কবল থেকে কবিতাকে মুক্ত করার প্রয়াস তার মধ্যে পূর্বাপর লক্ষণীয়। শ্রেষ্ঠ কাব্যিক প্রকাশের উপযোগী সমুন্নত ভাষা ও সাধারণ ব্যবহারোপযোগী আটপৌরে ভাষার মধ্যে তিনি পার্থক্য করতেন এবং আত্যন্তিকতার অপবাদ নিয়েও ছিলেন কাব্যাদর্শের কঠিন শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী।

হফমান্সথালে অবস্থা একটু ভিন্নরকম। কবিতাকে সকল রকম তুলনার মান থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু কবিতা হিসেবেই দেখার মধ্যে আছে কাব্যিক সত্যের কাছে পৌছার আকাঙ্ক্ষা, এবং এদিক থেকে দু'শ্রেণীর সৃজনকর্মীর আমরা সাক্ষাৎ পাই—প্রথম, যারা আপন সক্রিয় চরিত্রে উজ্জ্বল, দ্বিতীয়, যারা শিল্পমাধ্যমের প্রতি অধিকতর অনুগত। প্রথম দলের কাজ সংস্কার-ধর্মী ও ভবিষ্যতমুখী; দ্বিতীয়দল কালের প্রভাবকে গ্রহণ করেন: তারা প্রবল ও সোচ্চার এবং স্মৃতির প্রবাহে গভীরভাবে নিমজ্জিত। হফমান্স-থালে এই দ্বিতীয় লক্ষণ খুবই স্পষ্ট: তাঁর কবিতার অবস্থানবিন্দু ঐকান্তিক-ভাবে মুহূর্ত--যা পরিণামে জগতের মূলগত ঐক্য আবিষ্কারে অক্লান্ত এবং সেই সঙ্গে ভাগ্যের অমোঘ ছায়াকে নির্দেশ করে। অনন্ত জটিলতার মধ্যেও এই বিশ্বজগৎ এক রহস্যমণ্ডিত গ্রথিত ঐক্য, যে রাত্রির দিকে ধেয়ে চলেছে এই ভাবটি হফমান্সথালের অধিকাংশ কবিতার মর্মবীজ।

আত্মগর্ব ও পরম সাহসিকতার সঙ্গে গেয়র্গ যে পবিত্র প্রাসাদ নির্মাণ করেন, হফমান্সথালে তাই আভ্যন্তরীণ জগৎ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কবিতার যাদুকরী দরোজা ইতিহাসের সর্বসময়েই উন্মুক্ত এবং কবির সাধনা মানুষের সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনের মধ্যেই নিহিত--যারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং জ্ঞানের থেকে কোন সাহায্য লাভ করে না তাদের কাছে কবিতা জীবন্ত সত্যের অন্তিম উৎসের মতো--এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

কবিতার পুনর্জন্ম দানের প্রয়াসে রুডলফ আলেকজাণ্ডার শ্রয়েডারের ভূমিকাও অবহেল্য নয়। তিনি আধুনিক ভাষায় ধ্রুপদী ঐতিহ্যের নব-নির্মাতা, এবং এদিক থেকে ক্লপস্টক হ্যেলডারলিনের উত্তরাধিকারী। বিশিষ্ট জার্মান রীতিতে কেবল ইলিয়াড-ওডিসিই নয় হোরাস-ভার্জিলেরও অনুবাদ করেছিলেন। পল গেরহার্ডের স্তবগানের ধারার নতুন রচয়িতা হিসেবে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মবিশ্বাসীদের তিনি খুবই প্রিয়।

পরিবর্তমান সময়ের প্রভাব ও কাব্যিক প্রকরণের মধ্যে অসঙ্গাতর উপাদান রাইনর মারিয়া রিলকের বিভিন্ন পর্যায়ের কবিতায় যেমন দেখা যায় তেমনটা আর কারুর ক্ষেত্রেই নয়। রিলকের খ্যাতি গেয়র্গ হফমান্সথাল কি লোয়ের্কেকে যে ছাড়িয়ে গেছে বহুদূরে তার কারণ মনে হয় তাঁর সূক্ষ্মতা ও গভীরতা: যা কিছু তিনি লিখেছেন, এমন কি চিঠিপত্রও, তার সবই যেন একটি গোটা সম্পূর্ণতার অংশ; উত্তরকালের জন্য মুদ্রিত তার প্রতিটি

শব্দ, প্রতিটি অক্ষরের মধ্যেই রয়েছে কবিতা ও কাব্যচিন্তার গাঢ়প্রলেপ। আর এইভাবে, আমরা নতুন করে তাঁর মধ্যে, উচ্চতর কাব্যিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কবিব্যক্তিত্বের যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা তার পরিচয় দেখতে পাই। সাহিত্য আইন শিল্পের ইতিহাস পাঠ, পুশকিন ডস্টয়েভস্কি ও অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কেয়ারকেগার্ডের প্রতি আকর্ষণ, আপন জীবনের ব্যর্থতা ও দারিদ্র্য বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধে মানুষের পাশবিকতা ও বর্বরতা, এই চরিত্র-গঠনে সক্রিয়। কাব্য প্রকরণে, উনিশ শতকের সমাপ্তির দিকে গেয়র্গের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে শুদ্ধ কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং গেয়র্গের মতোই স্বরবর্ণের ধ্বনিসাম্য, শব্দ সংহতি ও কবিতার অন্যবিধ গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল অনুভববাদ (impressionism) ও মরমীয়তার সংঘাতে নতুন কবিতার জন্ম হবে।

অস্কার লোয়েকের্কে ও গেয়র্গ ট্রাক্‌লের কবিতায় কবির ব্যক্তিগত অভি-জ্ঞতার উপাদানসমূহ আবার পশ্চাৎপটের দিকে অন্তর্হিত।

ট্রাক্‌লের উত্তর কবিতাবলীকে প্রকাশবাদী (Expressionistic) বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলাই যুক্তিসঙ্গত।

উনিশ শ' চৌদ্দ সালের পূর্ববর্তী কয়টি বছর, মোটামুটি উনিশ শ' এগারো থেকে তেরো পর্যন্ত যদিও দশের মধ্যেই শুরু, জার্মানীতে আদি প্রকাশ-বাদের উৎপত্তি, এবং এই সময়কার প্রধান কবিকণ্ঠ হেইম ট্রাক্‌ল বেন ও স্ট্রাম। প্রকাশবাদের মোদ্দাকথা, জগতের বস্তুনিচয়ের আন্তরিক সত্য-টুকুই প্রকাশযোগ্য শুধু তার রূপের বর্ণনা ও নামের উল্লেখ নিরর্থক এই আন্তরিক সত্য প্রত্যেক লেখকের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র; এই বিশ্বাসের কেন্দ্র 'সভ্যতা' যার বাইরেটা চকচকে ও সজ্জিত, কিন্তু ভিতর অন্তঃসার-শূন্য, পচা ও গলিত। প্রকাশবাদী কবিতায় এই নেতিবাদীসুর সর্বত্র ধ্বনিত। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পর কয়টি বছরে কবিতার নতুন উত্তরাধিকারে, যার মধ্যে ছিলেন ব্রেখ্‌ট্‌ ও বেরকেল, সকল বাধা ও বিপত্তির প্রতিষেধক মানবতা-সাধনা, এই বাণী জেগেছিল; কিন্তু পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে (১৯৩৩) সকল আশা নির্মূল হতে থাকে। নাৎসী আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়ায় অনেক কবি দেশ ছেড়ে গেলেন, আর যারা থেকে গেলেন তারাও হলেন আগের তুলনায় সমাজ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে জার্মেনীতে গীতিকবিতার নব উন্মেষ ঘটে, এবং যদিও তার বেশির ভাগই বর্জনযোগ্য, তবু এই অভিঘাত পূর্ববর্তী কবি সম্প্রদায়ের রচনাবলীর প্রতি সৃষ্টি করলো জাতির নতুন আগ্রহ। এই সময়েই পূর্ব জার্মেনীতে বের্টল্ট ব্রেখ্‌ট্‌ পূর্ব জার্মেনীর প্রধান কবি, এবং সমকালীন জার্মান সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

কাব্য ভাবনার দিক থেকে জার্মান কবিতার সর্বাধুনিক রূপটিকে বলা যায় বিমিশ্রিত: সব দেশের আধুনিক কাব্যধারা সম্পর্কেই অবশ্য একথা সত্য। তবে সাম্প্রতিক জার্মান কবিতার মূলধারা যে অনুভববাদ ও প্রকাশবাদে সমন্বিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্তিত্ববাদের দিকে প্রবাহিত, এও নিঃসন্দেহ। এর কারণ বোধ হয় একদিকে বিশ্বসত্য ও অন্যদিকে ব্যক্তির আত্মমুক্তি এ দু'য়ের প্রতি জার্মান মানসের সর্বকালীন যুগপৎ আর্কষণ।

প্রকাশবাদী ধারার মধ্যেই আধুনিক জার্মান কবিতার রূপটি ব্যাপক ও সার্থকভাবে অঙ্কিত হয়েছে। সেজন্য তার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়। পরবর্তী কোনো প্রবন্ধে এই আলোচনা তোলবার ইচ্ছে রাখি, কারণ এই দিকের বিশ্লেষণধর্মী পর্যবেক্ষণে আমাদের কবিতা উপকৃত ও অধিকতর অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে।

১৯৬৬

একজন শিল্পী সৃজনপ্রক্রিয়ার ভিতরে ঠিক কিভাবে জড়িয়ে থাকেন তা প্রায় প্রাকৃতিক রহস্যের মতো দুর্বোধ্য, এমনকি সেই সময়কার পুঙ্খানুপুঙ্খ রোজনামচা থাকলেও; তিনি ভূরি ভূরি উপকরণ থেকে ছেঁকে তোলেন সারবস্তু; এবং আমাদের হাতে যা তুলে দেন তা যেন ছাপার হরফের মতোই নিশ্ছিদ্র, 'অমানুষিক'। তিলে তিলে ভস্মীভূত হয়ে নির্বাপিত অঙ্গারের মাঝে তিনি জন্ম দেন হীরকের, এবং পৃথিবী সেই হীরক পেয়েই সন্তুষ্ট—তার অনেক বিনিদ্র রাত্রির, অনেক দুঃখের, অনেক যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত জানবার জন্য তাঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

তবু, রচনাকে সম্ভব করবার জন্য শিল্পীর যে আত্মসংগ্রাম তা চিরন্তন এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি রচনার বেলায়ই সেই সংগ্রাম স্বতন্ত্র। এজন্যই ট্র্যাজেডি হওয়া সত্ত্বেও হ্যামলেট আর ওথেলো এক জিনিস নয়।

সব যুগেই শিল্পীর আত্মসংগ্রাম সত্য, তবু স্বীকার করতেই হবে যে, সব যুগই চেনা-অচেনা অনেক পথের পাশাপাশি, কিংবা তাঁদের মধ্য দিয়ে, নিজের সরণি কেটে নিতে বাধ্য। এক যুগের সেরা রচনা ক্লাসিক হতে পারে, কিন্তু তাই বলে সমকালের কাছ থেকে নতুন নতুন রচনার প্রত্যাশা আমাদের কমে না।

বিশেষ করে উপন্যাস সম্পর্কে একথা অধিকতর সত্য এই জন্য যে, উপন্যাস বাস্তবতার সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং প্রয়োগমূল্যের দিক থেকেও প্রায় অনন্য, যদিও সিনেমা অধিকতর জনগ্রাহ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে সিনেমা মূলত কারিগরি-শিল্প এবং যেসব ক্ষেত্রে তা ললিতকলা হয়ে ওঠে সেখানে তার সামূহিক চরিতার্থতাই মুখ্য জিনিস; তার মানে একটা ভালো আর্টফিল্মের জন্য একটা ভালো উপন্যাস চাই, ক্ষমতাবান অভিনেতা অভিনেত্রী চাই, উপরন্তু চাই উপযুক্ত চিত্রগ্রহণ ও শব্দনিয়ন্ত্রণ। উপন্যাসে লেখকের মতো এখানেও পরিচালকই অবশ্য সর্বনিয়ন্তা, তবু উপন্যাসের লেখকের মতো চলচ্চিত্রের পরিচালক এতটা স্বয়ম্ভু নয়।

লেখ্যশিল্পের মধ্যে উপন্যাস যে সর্বগ্রাসী, তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, উপন্যাসের মধ্যে সর্ববিপরীতের সমন্বয় যতটা সার্থকভাবে সম্ভব ততটা আর কিছুতে নয়। উপন্যাস নাটক নয়, তবু নাটকের বহু গুণ তার অন্তরে চালিয়ে দিতে পারি; উপন্যাস কবিতা নয়, তবু কবিতার বহু লতাগুল্ম পাথর নুড়ি মণিখণ্ড তার ভিতরে ছড়ানো দেখলে বিস্ময়ের কিছু নেই; উপন্যাস প্রবন্ধ নয়, কিন্তু তার কাছে. টলষ্টয় বা ডস প্যাসসের পরে প্রবন্ধের আকাঙ্ক্ষাও সমূলক। উপরন্তু অন্যান্য ললিতকলা, যেমন সঙ্গীত চিত্রকলা ভাস্কর্য স্থাপত্য, এগুলোর গঠনপদ্ধতি ও শিল্পমায়া কোনো কোনো উপন্যাসে দেখা দিতে পারে, এবং তাও স্বাভাবিক।

একমাত্র উপন্যাসই একদিকে ব্যক্তির অবচেতনের গভীর অচেনা দুর্ভেদ্য সত্যের সংকেত, অন্যদিকে একটা বৃহৎজাতির সার্বভৌম পরিচয় বহনে সক্ষম। এজন্যই বোধ হয় উপন্যাসকে বলা হয় আধুনিক মহাকাব্য। অবশ্য প্রাচীন মহাকাব্য স্বর্গমর্ত পাতালকে এক সূত্রে গ্রথিত করছিল, কিন্তু আধুনিক মহাকাব্য যেন নরক আবিষ্কারেই অধিকতর আগ্রহী। কিন্তু এও ধ্যানধারণার স্থান-চ্যুতিমাত্র, পূর্ণ রূপান্তর নয়, যেমন প্রাচীন মহকাব্যের নায়ক বিভিন্ন দুর্দৈব ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামরত, অপরপক্ষে আধুনিকের সংগ্রাম মূলতই আত্মক্ষয় তা বলাই বাহুল্য। এবং এখানেই শেষ নয়, উপন্যাসের আধার এমন এক সঙ্কোচন প্রসারণ ক্ষেত্র যা ধারণে-ক্ষরণে, আঁধারে-ঔজ্জ্বল্যে বিয়োগে-বিন্যাসে-সারল্যে বৈদগ্ধ্যে সমকালীন বিমিশ্রণ ও জটিলতার সবচেয়ে উপযোগী।

এইজন্য স্থান কাল পাত্রের দ্বারা উপন্যাস যতটা বেশী আক্রান্ত, ততটা অন্য কোন লেখ্যশিল্পই নয়। কবির পক্ষে আত্মরতি-পরায়ণ ও উদ্ভট হওয়া সহজ, এবং অনেক ক্ষেত্রে সেজন্য তিনি বাহবাও পেয়ে থাকেন কিন্তু পরীক্ষার উচ্চতম মুহূর্তেও উপন্যাসিক একটি সীমারেখার ভিতরে থাকতে বাধ্য। এবং এজন্য জয়েস কখনো কখনো পীড়াদায়ক হলেও পরিত্যাজ্য নয়, কারণ কেবল য়ুলিসিস নয় তাঁর পরবর্তী রচনার মধ্যেও এমন একটা ছন্দ ও সুমিতি আছে যা সকল আক্ষেপ ও উত্তেজনাকে এক সামঞ্জস্যে উত্তীর্ণ করেছে। আধুনিক উপন্যাসে উপাখ্যান অতিমাত্রায় বিস্ফোরিত, এটা তার সাফল্যের লক্ষণ তা মনে করা ভুল, আসলে উপন্যাসের প্রাথমিক সর্ত একটি অবয়ব-সম্পন্ন সুষম কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা কোন কালেই হয়তো নিঃশেষিত হবে না।

দ্বিতীয়ত, যদিও ঘটনাই অভিজ্ঞতা নয় বরং অভিজ্ঞতা ঘটনাবলীর স্তম্ভিত নির্যাস তবু উপন্যাসের অভিজ্ঞতা মূলত সমকালীন সমাজ ও ব্যক্তি-মানসেরই দ্বিতীয় দর্পণ। সেজন্য ঔপন্যাসিকের থাকতে হয় বৈজ্ঞানিকের কঠোর ব্যবচ্ছেদ-ক্ষমতা, সমাজতাত্ত্বিকের দূরদর্শী বিশ্লেষণশক্তি, দার্শনিকের প্রজ্ঞা ও প্রেমিকের হৃদয়। তিনি সমকালকে চিরন্তনের মধ্যবিন্দুতে স্থাপন করেন, এবং সেজন্য সমকালের তরঙ্গ ও মূর্ছনাই তাঁর প্রধান উপাদান, সমকালের রুচি ও রসবোধের, গ্রহণ ও প্রেরণার যে তার বাঁধা থাকে, তার সঙ্গে মিলিয়েই তিনি নিজের তারগুলো সংযোজন করেন এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি দেন, যদি থাকে কিছু দেবার, নতুন কোনো সুর ও সঙ্গীত। এবং তৃতীয়ত, তিনি যেহেতু গদ্যরচয়িতা সে কারণে লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে সজাগ ব্যক্তি। বন্ধনের মধ্যে মুক্তির সৃষ্টি কবির সাধনা, এবং একাজ কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুক্তির মধ্যে বন্ধন রচনাও সহজ কথা নয়। বিশেষত যখন এই বন্ধনই আনে আবার মুক্তির সংকেত। কবির মতো ঔপন্যাসিকও জনবুলির নব নব সম্ভাবনার ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন, কিন্তু, কবি যেখানে সহজেই ভাষায় দূরত্ব সৃজনের সুবিধা-ভোগী, সেখানে ঔপন্যাসিক নরমে-গরমে সামঞ্জস্যসাধনের কঠিন কর্তব্যে নিয়োজিত।

এই সমস্ত কারণে উপন্যাসের সমস্যাই সবচেয়ে প্রচুর এবং বিচিত্র। আমার কাছে উপন্যাসের সমকালীন সমস্যাগুলো যেভাবে উপস্থিত হয়েছে তাকে আমি দু'টো ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করে বুঝতে চাই। প্রথম বহির্মণ্ডলীয়, এবং দ্বিতীয়, অন্তরঙ্গ। বহির্মণ্ডলীর সমস্যাগুলো পরিবেশের দান কাজেই তারা পরোক্ষ, আর অন্তরঙ্গ সমস্যা উপন্যাসের শিল্পকলাগত প্রশ্নেরই নামান্তর।

বহির্মণ্ডলীয় সমস্যাকে তিনটি উপবৃত্তে বিন্যস্ত করা সম্ভব, তাহল পাঠক রুচি, প্রকাশক-মনস্তত্ত্ব ও সমালোচনা। বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানত এই দিকটাই আলোচ্য।

সমকালীন পাঠক-রুচি যেন রকমফের মাদকদ্রব্যের মতোই উত্তেজক সাহিত্য-পদার্থ চায়, চায় যৌন আবেদনমূলক উপাখ্যান। নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের জন্য আদমের অদম্য আকর্ষণের রূপক এমনভাবে হয়তো আর কোনদিন সার্থক হয়নি: কারণ এখন বিকৃতির প্রতিই কৌতূহল, বিকৃতিতেই সান্ত্বনা।

এই বিকারের ঢেউ ইউরোপ-আমেরিকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া; এবং আমরাও যুদ্ধ দেখেছি। দেখেছি ধ্বংস, সকল নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অপমৃত্যু দুর্ভিক্ষে। তার পরেই তথাকথিত স্বাধীনতা। আর চক্রান্তের রাজনীতির বহুরূপী চরিত্র: ফলে আশাভঙ্গ, হতাশা, নৈরাশ্য। দুর্ভিক্ষে লাখে লাখে আমরা, এমন প্রাচুর্যের দেশেও, প্রাণ দিয়েছি কিন্তু পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেয়েও সেই দুর্ভিক্ষকে জয় করতে পারিনি। উপরন্তু পাউডার মিল্কের মতো আমরা নৈতিক খাদ্যও কিছু পেয়ে গেলাম সাগরপারের সভ্য দুনিয়া থেকে. পেলাম হত্যা ধর্ষণ লোমহর্ষক কাহিনী-ভরা পুস্তকাবলী, উলঙ্গ ছবির বহু পত্রপত্রিকা।

আমাদের সৃজ্যমান মধ্যবিত্তশ্রেণী কোমর সোজা করে দাঁড়াবার আগেই এমন ঝড় ঝাপটার মুখোমুখি হয়েছে, যাঁকে প্রথমদিকে মোকাবেলা করলেও শেষ পর্যন্ত আয়ত্তে আনতে পারেনি। মুক্তির পথ কোনদিকে সে জানত, কিন্তু আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে সে বুঝতে শিখল সে পথও ক্ষতবিক্ষত, এবং স্বর্গের সন্ধান দেয় না। তার সিদ্ধান্ত হয়তো বা ভ্রমাত্মক, তবু সত্য, যার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি শূন্যতায় বিচরণ ও ক্ষয়ের শিকারে পরিণতি।

এখানে বলা দরকার প্রত্যেক সাহিত্যেই যুগপৎ ভাবে তিনটি ধারা প্রবহমান থাকে, জনপ্রিয় বহির্তরঙ্গ, মূলস্রোত এবং পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপ। জনপ্রিয় বহির্তরঙ্গ সরল, ঐতিহ্যপ্রবণ এবং অনেকাংশে রমণীয়, এমনকি বটতলার সাহিত্যও তার অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে নিম্নভাগ। এই ধারা সংবাদ পরিবেশনকারী, উল্লাস সংগঠক, এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় এজন্য যে, এই ধারাই সংস্কৃতির গতিবেগ অক্ষুণ্ণ রাখে। পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপের ভূমিকাও সুদূর-প্রসারী, কারণ তার মধ্যেই নিহিত নতুন সম্ভাবনা, নতুন দিগন্তের উন্মোচন। বলাবাহুল্য, মূলস্রোত আনন্দ বেদনা লঘুগুরু উভয় এবং আরো বহুবিধ প্রকৃতিকে নিয়েই গুরুতর, ব্যক্তির ও জাতির প্রকৃত রক্তধারা এর মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত; এর মধ্যেই তাদের অস্থিমজ্জা, শাঁস এবং সারবস্তু তবুও একথা ঠিক, বহির্তরঙ্গ ও উৎক্ষেপ অতিমাত্রায় বিভ্রান্ত হলে, যথেষ্ট শক্তি নিয়েও সে বিচলিত না হয়ে পারে না। এই কালে রম্যরচনার বড়ই প্রসার এবং সেই ভঙ্গি সাহিত্যের মূল্যস্রোতকে যে আচ্ছন্ন করেছে তাই শঙ্কার

বিষয়। পাঠকরুচি সাহিত্যে কতবড় দিকদর্শনযন্ত্র এইখানে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে।

প্রকাশকের বিশেষ মনস্তত্ত্বের জন্য পাঠকরুচিই যে অনেকটা দায়ী তাও ঠিক। প্রায় নিরান্নব্বুই জন প্রকাশকের একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যবসা, যার মানে মুনাফা অর্জন। সেজন্য পাঠক কোন্ জিনিস পছন্দ করে সে তার জানা চাই; এবং বিশেষ ধরনের প্রচ্ছদ তার মালকাটতির সহায়ক বলেই ভিতরের সঙ্গে বাইরের কোনো সম্পর্ক রাখার জন্যও তোয়াক্কা করে না। এটা যে নীতিবিগর্হিত, এবং চরম প্রতারণা, সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকলেও ভীত নয়, কারণ আইনের সম্মুখে সে নিরপরাধ। এই প্রকাশকই, বিক্রির জন্য বাইরের তাকে ধর্মগ্রন্থ সাজিয়ে রাখে আর ভিতরের দেরাজে রাখে নিষিদ্ধ বই, পত্রপত্রিকা। ক্রেতাদের তারা চেনে, এবং ক্রেতারাও তাদেরকে জানে, ফলে কারুর কিছু অসুবিধে হয় না। এই ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি কতটা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত ভারতীয় পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ।

ভারতীয় পুস্তকের পুনর্মুদ্রণে সুবিধা অনেক; দলিল লাগে না, লেখককে পয়সাকড়ি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, বিজ্ঞাপন না দিলেও চলে কোন রকমে একটা মুদ্রিত বই যোগাড় করতে পারলেই সমস্যার শেষ, মলাটটা ছিঁড়ে ফেলে ফর্মাগুলো প্রেসে দিয়ে ছাপিয়ে আনা, আকর্ষণীয় সুন্দর নতুন প্রচ্ছদ আঁকার মতো শিল্পী যথেষ্টই আছে। এক সপ্তাহে বিক্রি খতম, গরম বই গরম পয়সা।

এই বর্ণনায় যে কোনো আতিশয্য নেই যাঁরা ব্যাপারটা জানেন তাঁরা স্বীকার করবেন।

অবশ্য প্রত্যেক সচেতন বুদ্ধিজীবীই কামনা করেন জ্ঞানের দরোজা উন্মুক্ত হোক, সুপ্রচুর হোক আনন্দের উপকরণ, বিশেষ করে সব দেশের ভালো বই নিজের দেশে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ এতে যে শুধু মানব-সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক চলাচলই ঘটে তা নয়, জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি পরোক্ষ অথচ গভীর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম। পাণ্ডুলিপির জন্য অর্থব্যয় না করে বাজার-চলতি বই ছাপাতে পারলে স্থানীয় লেখকদের কেয়ার করবার প্রয়োজন থাকে কি?

লেখা ছাপা হচ্ছে না, লেখকরা লিখছেন না; কিংবা লিখলেও সেগুলো দেরাজের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকছে। অবশ্য বটতলার পাবলিশার সব সময়ই মেলে, কিন্তু তাদের ব্যবহার আমাদের আলোচ্য নয়।

তৃতীয়ত, সমালোচনার পরিস্থিতি। সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন সাহিত্যের বিকাশে সমকালীন সমালোচনার দায়িত্ব অনেক, অথচ শিল্পীর প্রাপ্তির প্রশ্নে সবচাইতে নিরাশ যেখানে হতে হয় তা এই ক্ষেত্রে। কোনো যুগের কোনো সমালোচনাই বিশেষ খাতির দেখায়নি। এই সত্য স্মরণে রেখেও বলা চলে, সমকালীন সমালোচনার বর্জনান্ত প্রকৃতি, কিংবা নিম্ন-মূল্যায়ন, বড় লেখককে ঘায়েল করতে না পারলেও, তাঁতে সাধারণেরা সহজেই কাত হয়ে পড়েন, অথচ সাহিত্যের ধারারক্ষায় এদের ভূমিকা অকাট্য, অবিচ্ছেদ্য। কোনো যুগে বড় লেখক না জন্মালে খুব ক্ষতির কারণ নেই, যদি সততাসম্পন্ন, পরিশ্রমী ও সহৃদয় বহু ছোটো লেখক সক্রিয় থাকেন।

অবশ্য প্রকৃত সমালোচনার দ্বিতীয় মানদণ্ড নেই, তবে রণকৌশল বলে একটা কথা আছে, যা কেবল রাজনীতি বা যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, শিল্প-সাহিত্যের বিচারেও প্রযুক্ত হতে পারে। যতই আমরা বলি না কেন, কালই সত্যিকারের সমালোচক; এবং কোন রচনা কালজয়ী, ভবিষ্যৎই তা নির্ধারণ করে, প্রকৃতপক্ষে এই মনোভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ ফাঁকির প্রশ্রয় আছে; কারণ সাহিত্যের ইতিহাসে এইটে দেখা গেছে সমকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমকালেই নির্ণীত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বন্দিত। হোমার সোফোক্লিস শেক্সপীয়র টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ এঁদেরকে সমকাল চিনতে পারেনি, কিংবা সম্মানিত করেনি একথা বলা অসম্ভব; আবার এঁরা যে চিরকালেরও দিকপাল, তাও সমকালেই অল্পবিস্তর স্থিরীকৃত।

তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই যে, প্রকৃত লেখক সমকালকে আত্মসাৎ করেন বলেই, তিনি সমকালের আত্মজ, এবং প্রথমদিকে বা মাঝে মাঝে আক্রমণের মুখোমুখি হলেও সমকালীন সমালোচনাই তাকে স্বকীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

সমালোচনার উচ্চস্রোত সেই প্রজ্ঞা ও জটিলতারই অংশ যা শ্রেষ্ঠ রচনার চতুষ্পার্শ্বে আবর্তসংকুল, অথচ মূলত তার অনুগত। এবং শ্রেষ্ঠ রচনা অনেক সময় নতুন সমালোচনারও জন্মদাতা।

কিন্তু সমস্যা এইখানে নয়; আসল কথা হল, সমালোচনার ঐতিহ্য বা সমৃদ্ধি যাই থাক সমকালীন সমালোচনার একটি নিজস্ব প্রেক্ষিত থাকা চাই এবং যদিও এই প্রেক্ষিতে চিরকালীন সাহিত্যাদর্শ সমন্বিত তবু তার চরিত্র কিঞ্চিৎ ভিন্নতর এইজন্য যে, সমকালীন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্য-ধারার অস্থিমজ্জা থেকে এর উৎপত্তি। এদিক থেকেই হয়তো এলিঅট বলেছেন, প্রত্যেক একশ' বছর পর পর সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। এবং সেইভাবে যুগের মেজাজ অনুযায়ী পুরনো লেখকেরা পুনর্বিন্যস্ত হবেন।

যাই হোক, শিল্প সাহিত্যের কতটকু পরিবেশের দান আর কতটুকু ব্যক্তি-প্রতিভার তা বলা মুসকিল, তবে এটা বোধ হয় মনে করা যায় যে, পরিবেশ যেমন ব্যক্তি-প্রতিভার জন্ম দেয় তেমনি ব্যক্তি-প্রতিভাও জন্ম দেয় পরি-বেশের; মূলত এ দুই পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। পরিবেশ ততটা অনুকূল নয়, অথচ আমাদের উপন্যাসের ফসল, প্রাচুর্যে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে অফুরন্ত না হলেও কিঞ্চিৎ দৃষ্টিযোগ্য হয়েছে এ নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ। বিগত আঠারো বছরে অন্তত আঠারোখানা ভালো উপন্যাস লিখিত হয়েছে, এবং তার মধ্যে দু'চার-খানা নিশ্চয়ই কালোত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য।

সমকালীন উপন্যাসের মূলস্রোতের দিকে তাকালে আশ্বস্ত হই এই কারণে যে, চোরাবালির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেলেও সে উৎস থেকে বিচ্যুত হয়নি: ব্যক্তিমনোবিকলন, গুরুতর সমাজ-ভাবনা এবং জাতীয় অন্বেষা এখনো তার প্রথম বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের প্রকরণ ও লিখনরীতিতে নবতর রূপান্তর সাধনের প্রয়াসও লক্ষণীয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, সাহিত্যে এই ধরনের পরিবর্তন কৃত্রিম উপায়ে কখনো সম্ভব নয়: একজন বড় প্রতিভা ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেন, সমকালকে করেন উজ্জীবিত ও অভিষিক্ত এবং আগামী কালেরও অনেকদূর পর্যন্ত আলোকের এমন ছটা ছড়িয়ে যান যার মধ্যে সেই ভাষার লিখনরীতিও সঞ্জীবিত থাকে। বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্র-শরতের লিখনরীতি গৌরবময় ঐতিহ্যে পরিণত, কিন্তু তাই বলে তাঁদের সকল সূত্রই বিয়োজনযোগ্য একথা মনে করা চলে না, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো উপন্যাসের গঠনপদ্ধতি যখন আশ্চর্যভাবে আধুনিক। সমকালীন উপন্যাসের পট ও পটভূমি, দৃষ্টি ও সৃষ্টি উত্তর-তিরিশেরই দান, যদিও কতিপয় অপোগণ্ড বালখিল্যতার আতিশয্যে

তা অস্বীকার করবার স্পর্ধিত উক্তি করে। নতুন লিখনরীতির জন্য দিচ্ছে বলে এই অপোগণ্ড বিভ্রান্ত বেয়াকুফদের সরবে ঢাকঢোল পিটানো, সেও এক ধাপ্পাবাজি।

অবশ্য একথা ঠিক যে, বাংলা উপন্যাসের প্রথাগত লিখনপদ্ধতি—যার মানে একটি সুন্দর সুগঠিত গল্প বলা—অনেককাল আগেই তার সম্ভাবনা নিঃশেষিত ; আধুনিক রুচি যে বৈদগ্ধ্য ও জটিলতা কামনা করে তার আধার ভিন্নতর হতে বাধ্য। সমকালীন ঔপন্যাসিক তার রচনার মধ্যে সেই প্রকরণের অনুসন্ধান চালিয়ে যাবেন, এটা তার স্বাভাবিক কর্তব্য, এবং এই অণ্বেষণে পূর্বসূরীদের অবদান তার শিরোধার্য। তিরিশের শ্রম ও সিদ্ধিকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা গ্রহণ করবো নতুন ফসলের আকাঙ্ক্ষায়।

উপন্যাস এ কালের মহাশিল্পঅভিযাত্রা, তার গন্তব্য কোথায় আমরা জানি না ; তবে এই যাত্রায়, যার একটি লক্ষ্য হয়তো বা মহামানবতার তীর্থ আবিষ্কার, আমরা যেন পিছিয়ে না পড়ি, ক্লান্ত না হই ; আলস্যের অচির-তার্থতায় হারিয়ে যাওয়ার বদলে উদ্যমে মৃত্যুবরণ, সেও ভালো। কাজেই এই অভিযাত্রায় আমাদের পা ক্ষতবিক্ষত হোক, রক্তাক্ত হোক।

১৯৬৬

ভেবেচিন্তে দেখলে মানতে অসুবিধে হয় না, প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত হওয়া সত্ত্বেও, পুরনো ও হাল আমল নির্বিশেষে শিল্পীমাত্রই বিদ্রোহী সৈনিক। কথাটা শুনে যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদরা চমকে উঠছেন নিশ্চয়ই? ঢাল-তরোয়াল কি কামান-বন্দুক হাতে নেই; এ আবার কিসের সেপাহী? কিন্তু না, যুক্তিটা নাকচ করা সম্ভব নয়; কারণ রাইফেল কাঁধে নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এমন অনেক শিল্পীর নামই আমরা করতে পারি।

তবু শিল্পী একটু স্বতন্ত্র বৈকি। এবং তার সংগ্রামের রূপও আলাদা; সে হল, এক দ্বৈতের নিরবচ্ছিন্ন উত্তরণ। প্রথমত তাঁর লড়াই নিজেরই সঙ্গে নিজের পরিণতির জন্য, দ্বিতীয়ত তার লড়াই পৃথিবীর সঙ্গে আরেক পৃথিবী তৈরী করবার জন্য।

প্রথম লড়াইটা চলে নিতান্ত সংগোপনে, হয়তো নেশা, নয় খেয়ালের খেলা; সন্ধ্যার সূর্যের রক্তিম আভায় একজন গকির পুরনো গল্পের বইয়ের শেষ পাতাটি পড়বার কসরৎ কি কালো হরফ সাজিয়ে সাজিয়ে একজন রবির খাতা ভরে তোলা, এই আপাত-সাধারণ ব্যাপারগুলোও তারই অংশ। এটা অভিনব সন্দেহ নেই। একদিকে নিজের মন ও মনীষার শীর্ষবিন্দুকে ধরবার চেষ্টা, অন্যদিকে তাকে প্রকাশ করবার মতো রূপ আয়ত্ত করা; এ কখনো সমুদ্রস্নান, কখনো অক্লান্ত পথযাত্রা, কখনো অগ্ন্যুৎপাত। ব্যর্থ প্রেমিক আত্মহত্যায় নিঃশেষ হতে পারে; কিন্তু শিল্পীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। প্রেমে ব্যর্থ হয়েও আত্মহত্যাকে জয় করা এবং তার উপর রক্তপদ্ম ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর ধর্ম। সব কিছুকে ধারণ করে সত্য সুন্দর শাশ্বতকে নির্ধারণ, রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এ

বড় কঠিন সাধনা। অথচ এতে সিদ্ধিলাভ করলেই শুধু শিল্পী সার্থক, অন্যথায় নয়।

দ্বিতীয়টি প্রথমেরই অঙ্গীভূত তবু তা আলাদা আলোচনার দাবী রাখে এই জন্য যে, এর থেকে বিচ্যুতিই অচরিতার্থতার সোপান। পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই, তার মানে পৃথিবীর মিথ্যা অন্ধতা সঙ্কীর্ণতা ঘৃণা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কথাটাকে একটু সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রচারক হতে বলছি না; তবু সার্ভেনটিসের ডেকামেরণ সেক্সপীয়রের হ্যামলেট বিঠোফেনের নবম সঙ্গীত কি পিকাসোর গার্ণিকা কি একেকটি প্রচণ্ড সংগ্রাম নয়? নিশ্চয়ই তাই, কারণ এরা যে সীমা থেকে অসীমে, অজ্ঞানতা থেকে চেতনায়—এক কথায় আত্মার মুক্তিরই বিভিন্ন আয়োজন। একেকটি জগদ্বিখ্যাত সৃষ্টি কত অন্তর্জ্বালা কত বিনিদ্র রাত্রির আয়ুক্ষয়ের ফল। এগুলো জীবনের নিগূঢ় সত্যকে মঞ্জরিত করেছে; আবার কতকগুলো আছে যা অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় উদ্বেগ ও আশাকে সামনে তুলে ধরে। কিন্তু এ কথাও ঠিক, যে কোনো রচনার জন্যই হোক, শিল্পীর আত্মবিস্তার ও আত্ম-অতিক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। এবং কোনো না কোনো ভাবে, তার জন্য চেতনার মানে অভিযাত্রা মানে অন্ধকার দিন, দুর্যোগের রাত্রি পেরিয়ে যেতে হবেই; এবং তখন এমনও হতে পারে, একজন কডওয়েল ভাবতে পারেন স্বাধীনতা শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য কলম ছেড়ে সত্যিকারের যুদ্ধফ্রণ্টে যাওয়াই সমীচীন। তাঁকে বাধা দেওয়ার কিছু নেই; আবার কাউকে জোর করে ঠেলে দেওয়াটাও মূঢ়তা। কারণ কেউ তাতে লাভবান হয় না—না আন্দোলন, না শিল্প।

আসলে এ চেতনার প্রশ্ন। এবং সব ব্যাপারেই শিল্পীর স্বাধীনতা অবশ্য স্বীকার্য। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, শিল্পী মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ রূপকার বলেই দেশ ও জাতিগত গণ্ডী ছেড়ে মহামানবতার দিকেই তার গতি; এটা তার দায়িত্ব কি কর্তব্য তাও নয়, আমি বলছি এটাই তার প্রকৃতি তার স্বাভাবিক পরিণতি। যে এতটুকু পৌছতে পারেনা, সে খণ্ডিত, অর্ধ পথেই মৃত। এই মানবিকতা প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীরই সৃষ্টিধর্ম ও জীবনধর্ম দুই-ই। কেউ কেউ সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ থাকেন; আবার কেউ কেউ তাতেই বদ্ধ না হয়ে বাস্তব কর্মেও নিজেকে প্রসারিত করেন। বলা বাহুল্য, এটা ত তার শিল্পসাধনারই সম্পূরক।

এই ব্যাপারটাকে শিল্পের সার্থকতার প্রধান শর্ত বিবেচনা করলেই দুনিয়ার সমকালীন শিল্পীদের ঔদাসীন্যে বিস্মিত হই। রচনা ও কর্ম দু'দিক থেকেই যেন তারা নীরব; আপন আপন প্রকোষ্ঠে বন্দী। রোমের নিষিদ্ধ পল্লীতে কৌতূহলী অভিজাত কন্যার অভিযান কিংবা ওয়ালষ্ট্রীটের পলিতবেশ ডলার কুমীরের শিকার কাহিনী লিখেই কি আমার দায়িত্ব শেষ হবে? না, তা নয়। সভ্যতার সংকটকে আমি চিত্রিত করতে পারি; কিন্তু সংকট উত্তরণটাই আসল ব্যাপার। মানুষকেই যদি মূল ধরি, তাহলে, শিল্পী হিসাবে এই প্রশ্নটাকে কি কোনক্রমে এড়িয়ে যাওয়া যায়? আমি বুঝতে পারিনে। জাতিবৈরী বর্ণবিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকতা এসমস্ত আধুনিক বর্বরতার মূর্তিমান পরিচয় প্রতিদিন সকালে উঠে খবরের কাগজ খুললেই পাওয়া যায়; কিন্তু এগুলোর সঙ্গে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন মানুষের বিলুপ্তি আশঙ্কা। আণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি তারই নিশ্চিত ইঙ্গিত নিয়ে আসে না কি?

এটাই মূল। কবিতা গল্প উপন্যাস যাই লিখি, তুলি দিয়ে ক্যানভাসের ওপর যাই আঁকি কণ্ঠে কি যন্ত্রে যাই গাই, এক মুহূর্তের জন্য একে বাদ দিতে পারি না; এবং তার বিরুদ্ধে দেশে দেশে আমাদের নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতায় বেদনাবোধ করি। এভাবেই শিল্পীনামের অমর্যাদা করব? অন্ধকারে আলো জ্বালবো না? মৃত্যুর ছায়ায় জীবনের বাণী শোনাব না? শুকনো বাগানে ফোটাবো না ফুল?

বর্তমানের দিকে চেয়ে নিরাশায় যখন মুহ্যমান, তখন, একটু দূরে দু'জনকে দেখতে পাই, পাশাপাশি রোঁলা আর রবীন্দ্রনাথ, দুই বন্ধু যারা প্রথমে সভ্যতার সংকট অনুধাবন করেছিলেন। ছোট বড় মাঝারি সকল দানবের বিরুদ্ধে তাঁরা আপসহীন সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন, এবং বীরের মতো উঁচিয়ে ধরেছিলেন কালজয়ী মানবতার উজ্জ্বল পতাকা। তাঁরা শিল্পী, তাঁরা সৈনিক।

তাঁরা আমার জাগ্রত আত্মা, আমার বিবেক, আমার ঐতিহ্য। তাঁদেরকে আমি ভালবাসি, এ আমার অহঙ্কার।

দুই

'হে ইউরোপ বিদায়···তুমি আজ কবরে পথ হাতড়ে ফিরছ, কবরেই তোমার স্থান, কবরেই তোমার শয্যা। জগতের নেতৃত্বভার অন্যে গ্রহণ করুক।'

রোঁলা লিখেছিলেন এই কথা উনিশ শ' ষোল সালের দোসরা নভেম্বর তারিখে, কারণ তাঁর রক্তে ভলতেয়রের বজ্রগর্ভবাণী, এবং হুগোর বিখ্যাত ভাষণও তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত, 'গোণা কয়েকটি দিন আমাদের আয়ু। সেই দিনগুলি যেন আমরা নীচ দুর্বৃত্তদের পা'য়ের তলায় গুঁড়ি মেরে না কাটাই।'

রোঁলা ভোলেননি সেই মানবীয় আত্মসম্মান ও বিবেকের মহান উত্তরাধিকার। তাই চুপ হয়ে থাকেননি। উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, 'আমি থামবোনা।' উনিশ শ' উনিশ সালের বসন্তকালে রচিত 'চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী'তে তিনি বললেন:

'হে মানবক্ষেত্রের শ্রমিকগণ, সমগ্র দুনিয়াতে বিক্ষিপ্ত হে সমধর্মী সহকর্মিগণ, যুদ্ধরত জাতিগুলির বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদ নীতির ফলে গত পাঁচ বৎসর সেনাবাহিনীর দ্বারা তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছ। আজ যখন সীমান্ত প্রাচীর আবার ধ্বসে পড়েছে, তখন, পুনরায় ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনের জন্য এই আবেদন তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। যে নতুন বন্ধন আজ আমরা বরণ করবো তা পূর্বের বন্ধনের চেয়ে আরো দৃঢ়, আরো শক্ত হবে।

যুদ্ধ আমাদের বিশৃঙ্খলার গর্ভে নিক্ষেপ করেছে। বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই তাদের বিজ্ঞান, শিল্প ও মনকে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োগ করেছে; আমরা কাউকে অপরাধী করতে চাই না। বিচ্ছিন্ন, একক মানুষের মানসিক দুর্বলতা আমরা জানি, বিপুল সমষ্টিগত শক্তির সমষ্টিগত ঘটনা-প্রবাহের আদিম শক্তিকেও আমরা চিনি; শেষটি আগেরটিকে এক মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হবার মতো বিপদের ইঙ্গিত সে পায়নি। এই অভিজ্ঞতা যেন ভবিষ্যতে আমার কাজে লাগে।

যে বাধাবন্ধনহীন শক্তিনিচয়ের পা'য়ে স্বেচ্ছায় সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে আমরা তা'দের কৃতদাসত্ব বরণ করে নিয়েছিলাম, তা যে আমাদের জীবনে কি সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে তা সর্বপ্রথমে আমাদের

স্বীকার করতে হবে। ঘৃণার যে অসংখ্য বিষাক্ত বীজাণু আজ ইউরোপের সর্বদেহ জর্জরিত করে ফেলেছে, তার জন্য ও বৃদ্ধিলাভের দায়িত্ব শিল্পীদের ও মনস্বীদের কম নয়; জ্ঞান ও কল্পনার অস্ত্রাগার থেকে তাঁরা পুরাতন ও নতুন, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক, যৌক্তিক ও কাব্যিক সর্ব প্রকারের বুদ্ধি বেছে নিয়ে এই ঘৃণার যুদ্ধে আঘাতের পর আঘাত হেনেছেন; মানুষের সাথে মানুষের অন্তরের মিলন ধ্বংস করতে তাঁরাও কম করেননি। যে চিন্তার প্রতিনিধিত্বের দাবী তাঁরা করেন সেই চিন্তার মহিমাকে তাঁরা কলুষিত করেছেন; মনস্বিতাকে তাঁরা উত্তেজনার উপকরণ হিসেবে বিশেষ কোনো কোনো গোষ্ঠী, রাষ্ট্র, দেশ ও শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। আজ এই বর্বর হানাহানির মধ্যে থেকে বিজয়ী বা পরাজিত প্রত্যেক জাতি বিক্ষত, বিনষ্ট এবং (মুখে স্বীকার না করলেও) মনে মনে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে বের হয়ে আসছে, এর মধ্যে জড়িত হয়ে মনস্বিতার মহিমাও খণ্ডিত হয়েছে।

এই আপস, এই অপমানকর মৈত্রী, এই গোপন দাসত্ব থেকে মনকে মুক্ত করতে হবে। চিন্তা কারও ক্রীতদাস নহে; আমরাই চিন্তার ক্রীতদাস। আমাদের জন্য কোনো প্রভু নেই, চিন্তাকে উঁচু করে রাখবার জন্য, তার আলোকে চিরদিন প্রোজ্জ্বল রাখার জন্য, পথভ্রমে যারা দূরে চলে গিয়েছে তাদের একত্রিত করবার জন্য আমাদের সৃষ্টি হয়েছে। অন্ধকারে অন্ধ বাসনা কামনার ঝড়ের মধ্য দিয়ে একটি স্থির বিন্দুতে, একটি ধ্রুব তারকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমাদের চলতে হবে। দম্ভ ও হানাহানি এদের মধ্যে কোনোটাই আমরা গ্রহণ করবোনা, দু'টিকেই বর্জন করে চলবো, একমাত্র সত্যকেই আমরা মানবো; মানবো সেই সত্যকে যে-সত্যের পা'য়ে কোনো শৃঙ্খল নেই, যে সত্যের পূর্ণতাকে ভৌগোলিক সীমান্তপ্রাচীর দ্বিখণ্ডিত করতে পারেনা, যে সত্যের বিস্তৃতির শেষ নেই, জাতি ও বর্ণের সংকীর্ণতা যে সত্যকে স্পর্শ করতে পারেনা। মানুষের নিয়তি ও জীবনযাত্রায় আমাদের যে কোনো কৌতূহল নেই তা নয়, আমাদের সমস্ত পরিশ্রম তো সেই মানুষের জন্যই। কিন্তু এ মানবতা পূর্ণ মানবতা, খণ্ড মানবতা নয়। বহু জাতিকে আমরা স্বীকার করিনা; আমাদের কাছে জাতি এক, সে জাতি অনন্য ও বিশ্বব্যাপী, যে-জাতির মানুষ দু:খভোগ করে, লড়াই করে বারবার পা'য়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়,

রক্তসিক্ত কঠিন পথে অশ্রান্ত চরণে এগিয়ে চলে। এ জাতি সমস্ত মানুষের এক জাতি। এ-জাতির প্রত্যেকটি মানুষ আমাদের ভাই। তারাও যাতে আমাদের মত এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সম্পর্কে সচেতন হতে পারে সেই জন্য তাদের আত্মকলহের শীর্ষদেশে মৈত্রীর এই তোরণ আমরা স্থাপন করছি। এ তোরণ এক বহুবিচিত্র চিরন্তন মুক্ত মনের মহাতোরণ।

চিন্তার স্বাধীনতার এই ঘোষণা মানবীয় প্রজ্ঞার এক মহত্তম দলিল। প্রথম মহা যুদ্ধের শেষে রচিত হয়েছিল এই ঘোষণা তারপরে আরো একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে; কিন্তু তবু এর গুরুত্ব কমেনি। মানুষ এর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাক্যকে সংরক্ষণ করবে, একেকটি পবিত্র বীজের মতো যা হবে দুর্যোগের আলোকবিন্দু, অন্ধকারে তারার প্রদীপ। এই ঘোষণাকে নতুন করে উচ্চারণ করবার, নতুন করে জপবার সময় এসেছে।'

রোঁলা নাৎসী শিবিরে তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জন করে নিজের বাণীর মর্যাদা রক্ষা করেছেন। তাঁর বাণী জীবনের অঙ্গীকার।

এমন আরেকজন ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, আমাদের দেশেই, আমাদের শিলাইদহে তিনি অনেকদিন অনেক রাত্রি যাপন করেছেন; তিনি বাংলা ভাষায় লিখতেন, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। অথচ এটা সত্যি এবং আরো সত্যি, জাতীয় কি আন্তর্জাতিক, মানব-সম্পর্কের কোনো ঘটনাই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সেজন্যই তাঁর দুঃখ বৃহৎ, আশা মহত্তর। আত্মসমালোচনার মধ্যেও প্রত্যয়ের অভ্রান্ত স্বাক্ষর। তাই 'সভ্যতার সংকটে' তিনিই লিখতে পারেন: 'জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে···আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত

আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।'

জ্ঞানীর ভাষা সত্য হোক, সত্য হোক শিল্পীর স্বপ্ন। বিশেষত, আফ্রোএশীয় নতুন জাতিসমূহের যারা আত্মার কারিগর তাদের প্রতিভা আনুক সোনালী শস্যের দিন।

১৯৬৫

পরিশিষ্ট

১

পুস্তক সমালোচনা

১

A good history of literature in any language, whether planned or unconscious, always based on a two-dimensional pattern— first, the documentation and secondly the evaluation of the works of the individual writers in the perspective of time.

Documentation means not merely the accumulation of facts and figures but also tracing out the thought-process and analysis of the socio-cultural network. Similarly, the function of criticism in a literary history should not only be processing of writers and linking them with different trends but examining them in their individual, sometimes rather 'native' traits as well.

The book under review had been in the preparatory stage when I was a final year student of Dacca University ; but I had the good fortune to hear my revered teacher Syed Ali Ahsan present his discourses in our literature classes. Later on I had some intimate discussions on various aspect of the book with my another most respected teacher and the co-author of the book Muhammad Abdul Hai. As the book came out, surely with some marked shortcomings, it was acclaimed as the pioneer work on the history of Bengali literature in our country.

The most remarkable thing that has been embodied in the book through different loosely-tuned essays is, in my estimate, the discovery of a current of writings by Muslim authors. For reasons well-known to all they were treated as outsiders in the histories of Bengali literature : Professor Sukumar Sen felt to write a 'seperate' book *'Islami Bangla Sahitya'*, but this only added another string of dissension to his massive History which very exhaustively dealt with the Hindu line of Bengali literature.

Our thanks are due to the authors of *Bangla Sahityer Itibritto* who by their sustained efforts had contrived to work

out a 'history'—a sort of descriptive catalogue which will satisfy the connoisseurs and the laymen as well. One may pause a question about the justifiability of such inclusions on the ground that these writings are more or less, detatched from the main current of literature and they, though quite formidable in numbers, are the offspring of *battala* where low-taste is the criterion and ignorance law. I personally disagree with this proposition, because it is true in some cases only. On the other hand bulk of the writings even in crude form are the specimens of a vigorous, some-times orthodox, self-realisation that had been crystallizing in rudimentary fragments amongst the Indian Muslims after the great fall of 1857.

Bangla Sahityer Itibritta in its second edition retained its original standard, in addition to some improvements here and there by way of elaboration and readjustments.

On close examination, however, one may take into account some defects in the work, that might have been avoided if the writers would have given a little more attention to the overall design. The following may easily be noted—(i) Lack of equilibrium between the styles of the two writers. A striking example of partnership in writing literary history is the case of Legouis-Cazamian, who, although foreigners, wrote the most successful history of English literature. Their work may serve a model to new writers of literary history in any language. (ii) Lack of proper co-ordination in narratives and analysis and as a result minor writers have been over-emphasised while the major ones have been dealt with in shorter space. (iii) Failure to acknowledge the two distinct phases of modern Bengali literature, for which the authors abstained from fitting a separate background while dealing with Sudhindranath Dutt, Jibananda Das, Bishnu Dey and similar other writers of the Thirties.

Bangla Sahityer Itibritto in its third edition, that may be prepared shortly, will be, I believe, more comprehensive and as such more commendable as a new history of Bengali literature.

২

Book-sellers sometimes, though solely for the sake of their business, set out to literary innovations that are not always devoid of novelty. Introducing of a series of Best Short Stories of prominent writers by Bengal Publishers of Calcutta is an obvious example of such inventiveness. The title may put the genuine critics in jeopardy, but the readers lose nothing anyway—having a forwarded volume adorned with a photograph of his beloved writer. I still remember the sensation when I was able to purchase a volume of Manik Bandopadhaya by spending rupees five only ; I stealthily unlocked my single-seated room at Salimullah Muslim Hall and at once closed it from within, to escape my story-hungry friends. The publisher could have deceived me, I was satisfied that I got to read some remarkable short stories, including some 'best ones' of the writer, in one single volume.

Recently when Abul Fazal's *Srestho Galpa* came into my hand I again experienced that mixed feeling and found myself more elevated as the author is personally known to me.

I am really very much happy that Abul Fazal is living with the new generation ; and I can meet him and talk to him the moment I desire. But what is more important, he unlike his contemporaries, is enriching our literature with newer additions. And here, I suppose, we can find his real worth.

There are two kinds of writers ; (1) Those who consider their art supreme and the whole of universe is subservient to it. (2) Those who are primarily social reformers.

Sometimes, a writer with lesser artistic perfection occupies a more important place in the history—particularly during

the time of national emancipation. He explores tradition, evaluates the past, discovers racial potentialities, and teaches as well as inspires his people. His works may suffer from crudity, but he can never be underestimated.

It appears from the writings of Abul Fazal that he took pen in his hand not out of fancy but as the mission of his life. And therefore he cannot rest. He began his literary career as a staunch supporter of *sikha-group* who during late twenties expounded the Movement of free-thinking against superstition, social inequity and religious fanaticism prevalent in the Muslim society of Bengal. In course of time, this confrontation had become his permanent feature and he came out as an exponent of liberal thinking, leaning towards leftist anarchism, at least in his later essays.

This explains both the limitations and force of his work, because as regards the former one, too much of partisanship by way of debarring the artist from variety cripples his work and gives to it a monolithic character that tells more of idealism than ripeness of experience. And because of this, it seems to me, he is docile and esoteric, unequivocal and naive. And in many a cases emotional paraxysm transforms his characters to more fluidity wherefrom the writer emerges out in apparent camouflage.

Here also lies the force in the sense that there are social criticism, unfailing and easily intelligible, conducive to the ideal of a new order.

In this background we can now look into his short stories that are very naturally conterminous with his novels. The present anthology contains thirty stories of different lengths, ranging from fifty-one to one-and-half pages. These were written during past few decades. The first thing, one may feel by reading the book, is that the publisher had chosen the title more to attract the readers than intending to make it seriously selective. Otherwise some pieces could have been easily dropped.

Secondly, the recurent theme of these stories is the conflict between individual and establishment and with one or two exceptions, the social canvas on which these penpictures were drawn, is lost. This I mention for the reason that the writer, in most cases, failed to explore those materials that are deeply contemporaneous and at the same time source of permanent values. A novelist may be a historian, a social scientist or even a biologist, but basically he is an artist whose preoccupation is not only to narrate things, but create men and women in boundless diversity of manners and passions. He is of his age and also beyond of his age.

Still it is true that Abul Fazal's short stories though chose social problem rather blatantly, provide greater amount of variety than his other writings do. Here we find many facets of human behaviour in particular setting or social conditions and the writer depicts them with confidence. When he speaks of various deceitfulness he does not speak sparingly whatever position his target may command in society, rather his satire becomes more or less severe when he hits the so-called bigwigs The Noble The Victorious The Reformer The Foreigners are the few specimens where the writer seems to be almost arrogant in exposing the masks; and in these and in similar other stories his purposefulness made him a vangaurd who does not indicate what is his goal but unmistakably wants to break through the bonds. These indeed have got historical value, but his real power is manifested, though not fully, in one or two stories in which he came down to ordinary life diffused in love and hatred, struggle and temptation. The World of Soil The Phenomenal Nature and The Evolution may be cited as examples.

The Evolution might have been a 'best story' by any standard if the writer could exploit the dramatic possibility of the situation and resist himself from overtaking. The plot and the characters are quite interesting, and the 'fall' of the Maulana Mohmmed Hossain instead of merely being the case

of a social change could be an eternal symbol of life and also of modernity, but due to carelessness it has ended in mediocrity.

One more thing to say, although the bounds of short story alongside with the novel have widened correspondingly, Abul Fazal was hardly inquisitive about that. He usually takes resort to flat narrations instead of using the canon of psycho-analysis, and so his short stories are mostly conventional in technique. His prose-style, however, is sometimes graceful and always bold enough to catch the readers' mind, even when he does not write such blunt passage as 'Maulana's eyes ramained fixed on her topless rounded breasts ; these reminded him of plump and big-size apples that he had seen in fruit-shops while in Deobandh and that can't be caught by one hand. He thought these were also unmanagable within one grip. He had never found such a swelling bosom in the Mulk of Bengal.

To conclude we can say that Abul Fazal, with all his limitations, is an important chapter of our literature. He gave us humanism, a liberal outlook to see into things and above all a character of a writer that is so wanting in us. His compositions, whether essay or fiction are invested with noble ideas but posterity will find that he was nobler than his works.

৩

The task of short story writer is a little bit orduous in the sense that he always has to strike the central point, even when the fable moves horizontally. And if the writer comes of a more contemporary origin he virtually hangs in the balance. Because modern literature in its perplexing bid for originality had so much broken the surface pattern that very often through inner dissection it transforms into omnium-gatherum where a mystical anarchy may exist but predominant is the organised nothingness. This sometimes even in simple state, is obscure and ambiguous and also philosophic whatever may be the perception. Of course, during past decade, in fictions like Nobokob's *LOLITA* or Kerouac's *ON THE ROAD* we find a turn which records a breakthrough in values rather than a breakup in the prevailing tenors.

Bengali short story has its own history of development, wherefrom if someone intends may draw a parallelism with its western genus even to the works of the Beats generation ; but this is also true that due to this background a somewhat conscious writer cannot go so far as to turn bizzare.

The first thing to note of Abu Rusd is that he deeply linked himself with this tradition and hence he, though modern in the true sense of the term, keeps away from vigorours modernism—not to dive into underwater but create a symphony on outer ripples with finer strokes.

Curiously enough, though primarily a novelist and only an occassional writer of short stories he moves with greater ease and confidence in short stories that are so few in numbers, offering the alert readers such credence that he, either for the sake of ambition or for a latent apathy, had deliberately forsken

this form which is so suited to his talent. Otherwise we would have had more short stories from his pen.

There are twelve stories in the present volume. By going through the book one will unmistakably conclude that the world depicted in these is of limited dimension, sometimes fading in a small family corner. These stories, with only one exception are, as if, small-size social frames cut out of middle-class stratum. Two or three characters put in and they neither suffer from nightmarish tensions nor bother about any non-human mistry, but moves thinly in scheduled spaces with pretence and pecularities.

Undoubtably, as his plan and treatment indicate Abu Rusd is a writer of moderate ambition. He rarely steps out of the circle that is conditioned by surface realism and in most cases it seems to me, he almost resolutely takes stock of most banal incidents that occur arround. And as being rather unwilling to let the manners of his characters circumfluent to a great extent he is inclined to exploit the situation in minute details in its nuance of meaning and implication. This method is his quality.

The title story may well be taken as the symbol of perfection that has been accomplished in the book. Not altogether though slightly, satiric in tone, it demonstated precisely a comment in wit, and although based on a much-used theme that not the accumulation of wealth and property but love, is the goal to happiness, it has become a fine story, mainly for its structure and balance.

Another story *THE RUN* attracts attention by its stringent abnormality. In a worn-out society like ours we used to see so many vices, apparently concealed under the stucco of average morality but still we are not ready to acknowledge such truth as extra-matrimonial sexual activities within a subdued domesticity. Here in this story we find not a usual triangle but a pentagonal relation involving five persons, men and women. This however, might have come out as material for

work of art, but despite ample coherence it merely served an individual case. The writer, it appears were much preoccupied with the final dialogue by which the husband, knowing from his wife that she in retaliation to his adultory with the maid servant once shared her bed with the private tutor of their son, declared proudly, as if to give her consolation that he did not let her sister go fresh with that tutor who eloped with her. Evidently, everything have been arranged for this and here lies the weakness, though its somewhat Boccacioan morbidity raised a pointer to our social degeneration.

How much flexible the art of short story can be, *THE MASTER OF DEATH AND MY MOTHER* and *KHOROSOB* are the two illustrations. The former is an interesting narrative set into a diameter, and as regards the later one I can't tell whether it is a personal essay or an impersonal reflex. Whatever may be it escaped the risk of being a grotesque and the blame of charlatanry, because the thing was seen from proper perspective and the materials have been handled very cautiously and with certain amount of reservation. Khorosob is the symbol of New Generation of the Soviet Union who by pioneering the exploration of the Space emerged as the hero of a New World too. His image is well-conceived. True that Bengali language is potentially capable of bearing the conspicuous overtones of allegory or symbolisation but the pattern itself is fake and formulated and so remains static the remoteness, even after employment of last artistic ability. The story under discussion could not escape this fate. Still it's enjoyable first because of human touches and unbiased outlook and secondly for some fine pieces of natural description.

Abu Rusd's short stories are a discovery to myself, though in his manner there is less discovery and more motivation. His prime drawback lies in his failure to create an extra-dimension which expounds richness and depth. He usually repeats moribund values that can be traced through the

themes presented in this anthology and anybody with a little bit of literary training will feel that these stories are rather stuffy where prevalent an atmosphere of conscious planning and restraint.

However, these can be excused for the reason that these are inherent with his achievement.

৪

শিল্পীর মানসযাত্রায় অভিজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতা কিভাবে সংস্থিতি লাভ করে তা বিজ্ঞানের চেয়ে প্রাকৃতিক রহস্যেরই অন্তর্গত, কারণ সে সমীকরণ এমনই বহু পল্লবিত ও জটিল যে, যে-কোনো একটা সূত্র দিয়ে তার পরিমাণ করা অসম্ভব প্রায়; কিছুটা সম্ভব হলেও সে সাধারণ ধারণার বিস্তার মাত্র, কোনো স্থায়ী সিদ্ধান্ত নয়। তার মানে, সেভাবে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি, কিন্তু তার ব্যাখ্যা দিতে পারিনা। এমন কি যেসব শিল্পীর প্রস্তুতির স্বাক্ষর আমরা পাই, যেমন দা ভিঞ্চি জোলা গগাঁ কি মম, তাদের বেলায়ও এ সমানভাবে প্রযোজ্য; কেননা তাঁদের স্কেচ বই জর্নাল কি ডায়েরী কেবল বহির্রেখাকেই নির্দেশ করে, সেই তাকে ধারণ করেনা যার নাম দিতে পারি অনন্ত অন্তরংগ প্রক্রিয়া।

শিল্পী প্রকাশই করুন অথবা শুধু সৃষ্টির মধ্যে থাকুন নিবদ্ধ তার সত্তায় এই আয়োজন অপরিহার্য। প্রাচীন কালের স্বভাব-কবিরাও কোনো না কোন ভাবে তাদের গোষ্ঠীকে অনুধাবন করতেন এবং এই উপলব্ধির পরিমাণ, আত্মীকরণ ও প্রকাশ-নৈপুণ্যের ওপরই নির্ভর করেছে তাদের প্রতিষ্ঠা; আধুনিক সৃজনকর্মী সমাজের সদস্য হিসেবে, পরিবেশের অবদান স্বরূপ স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত উপাদান লাভ করেন, প্রাথমিক অবস্থাতেও তার বহুগুণ বেশী তাকে অর্জন করতে হয় সচেতন প্রয়াসের দ্বারা—অভিনব ও উদ্ভট কিছু করতে হবে এজন্য নয় বরং এ ছাড়া তার সমকালীন প্রবাহ রেখার নীচে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা যার অর্থ প্রথানিহিতি অথবা পুরাতনের বর্জনীয় ও বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি। ভাষাশিল্পীকে আরও বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হয় এজন্য যে ভাষা জীবনের বাস্তব কাঠামো ও মানবীয় অন্তর্লোকের সংগে গভীরভাবে সম্পৃক্ত বলে এর চরিত্র অনেক বেশী স্পর্শকাতর ও নমনীয়।

লেখক সচেতনই হোন, কিংবা অচেতন বা উদাসীন, তার সংগে এই সম্পর্ক সাধারণত ত্রৈমাত্রিক, যেখানে আছে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সমকালীন

জীবনতরঙ্গ। এ তিনের সংগেই একটা পরিমাণ স্বাভাবিক সংযুক্তি তার রয়েছে, কিন্তু যে নিমজ্জন ও উজ্জীবনে শিল্পসিদ্ধি তার অনেকটাই সাধনালব্ধ।

শিল্পী যেখানে সৃষ্টির মধ্যেই আত্মস্থ সেখানে তার শিক্ষা ও দর্শন, যদি কিছু থাকে, তা সামগ্রিক রসবস্তুরই অংশ, ফলে তা বৈচিত্র্যময় এবং কোনো কোনো সময় পাত্রভেদে, ভিন্নতর আবেদনগ্রাহ্য। কারণ শিল্প তো, শেলী কবিতা সম্পর্কে যা বলেছেন এখানে তা স্মরণ করতে পারি: সকল উন্নত কবিতাই অনন্ত, এ যেন প্রথম ওকবৃক্ষের বীজ সকল ওকই যার মধ্যে রয়েছে অব্যক্তভাবে। আবরণের পর আবরণ উন্মোচিত হতে পারে, কিন্তু অর্থের অনাবৃত অন্তরতম সৌন্দর্য কখনো প্রকাশিত হবেনা। মহাকাব্য যেন এক প্রস্রবণ, নিত্যকাল তা থেকে প্রজ্ঞা ও আনন্দের সলিল উচ্ছ্বসিত হচ্ছে; এবং এক ব্যক্তি ও এক যুগ তার বিশিষ্ট সম্বন্ধানুযায়ী এর দিব্য প্রভাব নিঃশেষে গ্রহণ করলেও, আর এক এবং তারপর আর এক যুগ আসে নতুন নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়--এ এক অদৃষ্টপূর্ব এবং অচিন্তিতপূর্ব আনন্দের উৎস।

কিন্তু কোনো কোনো শিল্পী আছেন যাঁরা তাঁদের রচনার প্রভাবের পরিমাণ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকা সত্ত্বেও অসন্তুষ্ট, তাঁদের বিবেচনায়, আরও স্পষ্টতর লোকহিতের জন্য। এর কতটা যুগের প্রভাব, আর কতটা ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তা বলা মুশকিল; তবে দুই-ই যে কার্যকরী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজসিংহ, আনন্দমঠের পরেও বঙ্কিমচন্দ্র যে লেখেন ধর্মতত্ত্ব কৃষ্ণচরিত্র এবং রবীন্দ্রনাথ গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গের পরে রাজাপ্রজা স্বদেশ সমূহ, তার কারণ এই। সত্তা তাদের দ্বিধান্বিত, তাই কথাশিল্পী হিসেবে তারা খণ্ডিত। কিন্তু এই খর্বতা পূর্ণ হয়েছে স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্দেশ্যে মঙ্গলের প্রবর্তনায়।

শিল্পীসত্তার ? [illegible]ত্রক সমীকরণ আবুল ফজলে কিরূপে দেখা দিয়েছে সে বিচার শুধু কৌতুহলোদ্দীপক নয় প্রয়োজনীয়ও বটে, কারণ আমাদের সীমাবদ্ধ ঘরে কি আমাদের আছে আর কি হতে পারে এই ধ-নের বিশ্লেষণ থেকেই তা জানা সম্ভব। কথাশিল্পী হিসেবে তার সিদ্ধি পরিমিত এবং তাও কালের কাঠামোর মধ্যে সীমায়িত, কিন্তু যেভাবে তিনি ঐতিহ্য,

সংস্কৃতি ও জীবন তরঙ্গকে গ্রহণ করেছেন তা যে মহৎ লক্ষণাক্রান্ত তার প্রবন্ধাবলীই তার দলিল। তিনি শিল্পের যুগে যুগে অবগাহন করে নতুন নতুন ভাবে আনন্দময় হয়ে ওঠবার মতো, কোনো স্থায়ী উৎস নির্মাণ করতে পারেননি; কিন্তু সে রকম অসংখ্য উৎস জন্ম নিতে পারে এমন উর্বরতাময় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলবার অভিমত দিয়েছেন এবং দিয়েছেন তা কখনো কখনো, বীরের মতো। আমাদের কাছে এই ভূমিকার মূল্য যে কি, তা ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান আমেরিকানদের কথা বাদ, এই কাছের ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর পক্ষেও কল্পনা করা কঠিন; কারণ তাঁরা স্বাভাবিক ভাবে মনে করতে পারবেন না শতাব্দীকাল কিংবা তারও বহু আগে তাঁরা যা প্রতিষ্ঠিত করেছেন সে সবের কথা এতদিনে আমরা বলছি তাও একান্ত নীচুগলায়। আর মানসিক বিদ্রোহ যেখানে ব্যক্তিগত, জাতিগত নয়, সেখানে বিচ্ছিন্নতাই সত্য। তবুও মূল্যবোধকে, অন্যের ক্ষেত্রে তা যত পুরনোই হোক, নিজের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার ও উপলব্ধি না করা পর্যন্ত তার কোন সার্থকতা থাকে না। কাজেই যত সংকুচিত ভাবেই হোক, তার উদ্বোধন মূল্যবান বৈকি।

কয়েকজন সাহসী পূর্বসুরী ও বন্ধুর কাছে আবুল ফজল নিজের ক্ষমতায় আঁকড়ে ধরে যে দীপ বয়ে নিয়ে এলেন তার দ্বৈতশিখা: মুক্তবুদ্ধি ও মানবতা। ধর্ম সমাজনীতি সব ক্ষেত্রেই মুক্তবুদ্ধির প্রয়োগ এবং মানুষের মংগলের আলোকে সবকিছুকে গ্রহণ—এই দৃষ্টিভংগীকে বারে বারে ধার দিয়ে ঝকঝকে শাণিত করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে অন্তত: ততদিন পর্যন্ত যতদিন না মানবসমাজ বিশ্বসভ্যতার পরিণতির প্রাথমিক ভিত্তিতে গিয়ে পৌঁছুতে পারছে, যার মূলগত বৈশিষ্ট্য হবে সকল রকম ভেদাভেদ বৈষম্য ও সংকীর্ণতার বিলোপ, এবং অর্থনৈতিক সাম্য ও আত্মিক স্বাধীনতা। সেখানে প্রয়াস ও প্রকৃতি শিল্প ও বিজ্ঞান, পরস্পর সামঞ্জস্য-পূর্ণ, সম্পূরক; আর মনুষ্যত্বই হবে মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের আলোড়ন ও উত্তেজনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস ও নৈরাজ্য এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগের পঙ্গুত্ব ও প্রতিক্রিয়া, আমাদের বুদ্ধিজীবী শিল্পীকে যে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছে তা অভূত-পূর্ব; এবং এ কথাও ঠিক, পাশ কাটিয়ে বা বাদ দিয়ে নয় বরং এর মধ্য দিয়ে পথ কেটে গিয়েই তার মুক্তির সম্ভাবনা। আবুল ফজল এই যুগধর্মকে

অনুধাবন করেছেন এ তাঁর প্রথম কৃতিত্ব। দ্বিতীয়ত তাঁর অভিজ্ঞা শিল্প-অভিজ্ঞতা রূপ পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিতে জাগ্রত না হলেও, তাঁর বাণী সর্বদাই ঊর্ধ্বায়িত যা সত্য সুন্দর ও মংগলের উদ্বোধক; সাহিত্যের পথ ও পাথেয়, শিল্পীর স্বাধীনতা, সভ্যতার সংকট ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর মতামত উদার-নৈতিক চিন্তাধারার ঘোষণায় উজ্জ্বল। বিশেষত, ধর্ম ও রাষ্ট্র এবং মানবতন্ত্র এই প্রবন্ধ দুখানি, যদিও পাশ্চাত্ত্য ভাবনারই পুনরুচ্চারণ, আমাদের নিজের ভাষায় নতুন করে বারবার পাঠ করা উচিত, কারণ নিভৃত মুহূর্তে হয়তো আমরাও চাই আমাদের জীবনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

লিখনশৈলী ও পরিচর্যার সীমিতরূপ নিয়েও আবুল ফজলের প্রবন্ধাবলী আমাদের কাছে এক পবিত্র আমানত, একথা দ্বিধাহীনভাবেই বলতে পারি। উপলব্ধির তীব্রতা তাঁকে করেছে অধিকতর পরিমাণে আদর্শবাদী এবং এ সাফল্যের দাম কম নয়।

৫

নাটক দুরূহতম সাহিত্যশিল্প বোধহয় এই কারণে যে, তার মধ্যে সর্বকলার সমন্বয় প্রয়োজন। কাব্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয় তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। উপরন্তু প্রসাধন, অংগসজ্জা, দৃশ্যপট, শব্দ সংযোজন আলো প্রক্ষেপণ এ-সবের ভূমিকাও সুদূরপ্রসারী। তা'ছাড়া নাটক লিখতে গিয়ে এমন কতকগুলো ব্যাপারকেও ভুললে চলে না যা শিল্পের সংগে সম্পর্কযুক্ত নয় অথচ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মঞ্চ-উপকরণের সুলভতা, সামাজিক বিচারভংগি, দর্শকরুচির মান, অভিনয়সম্ভাবনা। দুনিয়ার দিকপাল নাট্যকারদের অনেকেই নির্দিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখের পানে চেয়ে নাটক লিখেছেন এটাও সত্যি।

এই ফিরিস্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি ভালো নাটক লিখিত হওয়ার জন্য দরকার নাট্যরচনার উপযুক্ত পরিবেশ। রঙ্গমঞ্চ চাই, কলা-কুশলী চাই, অভিনেতা-অভিনেত্রী চাই। আর এসবই সম্ভব কেবলমাত্র তেমন জাগ্রত জীবন্ত সাংস্কৃতিক অবস্থার মধ্যে যেখানে সাফল্য ও হতাশা, দুঃখ ও উদ্দীপনা পাশাপাশি বয়ে চলে।

নাট্যরচনার উপযুক্ত পবিবেশ ছাড়াই আমাদের নাট্য-সাহিত্য গড়ে উঠছে এবং তার উৎকর্ষ ও পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর নয়, এটাই আশ্চর্য। প্রচণ্ড নাটক হযতো লেখা হয়নি, অভিনয়যোগ্য জনপ্রিয় নাটকও মুষ্টিমেয়, তবুও এরই মধ্যে ঐতিহ্যপ্রবণ সাধারণ নাটক থেকে চরম পরীক্ষামূলক অত্যাধুনিক রচনারও সন্ধান মিলবে।

আজকের আলোচ্য তিনটি নাটকগ্রন্থ আমাদের নাট্যসাহিত্যের তিনটি স্পষ্ট রেখাকে ইশারা করে বলে আমার বিশ্বাস। সে হয় ঐতিহ্যপ্রবণতা, মননশীল ভংগি ও পরীক্ষামূলক প্রয়াস।

আবুল ফজলের 'কায়েদে আজম' ঐতিহ্য-প্রবণ, বর্ণনাত্মক রচনা যার মধ্যে কারুকলার চাইতে বিষয়টাই মুখ্য। যে যুগস্রষ্টা পুরুষ এই নাটকের উপজীব্য, তাঁকে তিনি গাঢ় বর্ণে চিত্রিত করেছেন। এই ধরনের রচনার প্রধান বাঁধা চরিত্রের ঐতিহাসিকতা এবং তা যদি হয় অত্যন্ত নিকটবর্তী কালের ও সর্বজনমান্য, তা'হলে সে বাঁধা প্রায় দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে। কিন্তু আলোচ্য নাটকের নায়ক-চরিত্র সকল প্রামাণিকতা নিয়েই এমন আকর্ষণীয় যে, তার জীবনচরিতের মধ্যে নবতর আবিষ্কারের প্রয়োজন পড়ে না। নিষ্ঠা, নিয়মতান্ত্রিকতা, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়চিত্ততা বাস্তবক্ষেত্রে এই সমস্ত দুর্লভ গুণাবলীর বিচিত্র প্রকাশের দৃষ্টান্তই যে শুধু রয়েছে এমন নয়, এই চরিত্রে সূক্ষ্ম-রসবোধ আর সহজ মানবিকতাও লক্ষণীয়।

দ্বিতীয়ত, এই নাটকের সামাজিক, রাজনৈতিক পটবিশ্লেষণও যথেষ্ট মূল্যবান। এই ক্ষেত্রে লেখক সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন এবং এর ভিতর থেকে প্রধান চরিত্র যথার্থ শক্তি ও ঋজুতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অন্যান্য চরিত্র সৃজনেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, তা'হল লেখক যদিও ভূমিকায় বলেছেন—তার দৃষ্টিভঙ্গি নাটক রচয়িতার ঐতিহাসিকের নয়, তবু শিল্পমানের দোলকটা যেন প্রধানত তথ্যের দিকেও ঝুঁকেছে। সেজন্য কোনো কোনো সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ, এবং সে কারণে চরিত্রের ক্রিয়াশীলতা ব্যাহত হয়েছে। তির্যক ঘটনার রক্তিম আলোকে চরিত্রসমূহ বিদীর্ণ হয়নি বলে রচনাটি উত্তরঙ্গ নয়, শ্লথগতি।

কিন্তু যেহেতু এই নাটক আমাদেরকে জাতীয় সত্তার মর্মমূলের সংগে একাত্ম করে সেজন্য এইটি আমাদের নাটকীয় ঐতিহ্যের অপরিহার্য অংশ।

মুনীর চৌধুরীর 'কবর' ও 'দণ্ডকারণ্য' তিন-তিন ছ'টি নাটিকার সংগ্রহ। কবরে রয়েছে 'মানুষ', 'নষ্টছেলে' ও 'কবর', এবং দণ্ডকারণ্যে 'দণ্ড', 'দণ্ডধর' ও 'দণ্ডকারণ্য'।

মুনীর চৌধুরী আমাদের প্রধান নাট্যকারদের অন্যতম, তবু মানতেই হবে যে, খ্যাতির তুলনায় তাঁর রচনার পরিমাণ অল্প। এবং এক রক্তাক্ত প্রান্তর যা মূলতই ফরমায়েসী লেখা ছাড়া অন্যান্য নাট্যরচনা বিভিন্ন পত্র-

পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ছিল। আলোচ্য দু'টি সংগ্রহ প্রকাশিত হওয়ার ফলে তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলী মুদ্রিতরূপে আমরা হাতে পেয়েছি বলতে পারি।

সব রচনা একসঙ্গে পেয়ে এখন আমরা নিঃসন্দেহ যে, এই নাট্যরাজি এক প্রতিভাবান শক্তিধর লেখকের রচিত। তিনি জানেন নাটক কতটুকু মঞ্চের, কতটুকু অভিনেতার, আর কতটুকু লেখকের এবং এই পরিমিতি-বোধ সর্বত্র স্পষ্ট। সংলাপ গঠনে সিদ্ধহস্ত তিনি। অনায়াসে ঘটনার গ্রন্থিমোচন করেন এবং চরিত্র স্থাপন করেন তার মর্মস্থলে। একটি সজ্ঞান বুদ্ধিদীপ্ত চমৎকারিত্বে প্রতিটি রচনা এমনভাবে আবৃত থাকে যা কারুর নজর এড়িয়ে যাবার কথা নয়।

'কবর' নাট্যাবলীর রচনাকাল উনিশ শ' সাতচল্লিশের সংলগ্ন পাঁচ সাত বছর এ কথা লেখক ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। সমকালের রক্তধারা বেয়েই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জন্ম, যেমন জোয়ারের মধ্যে লালপদ্মের, কিন্তু এর জন্য শিল্পী-মানসের পরিণতিও চাই। কারণ কালের নৈকট্য দৃষ্টিকে সহজেই করে আচ্ছন্ন। অতি-নিকটকে দূরত্বের মধ্যবিন্দুতে স্থাপন করবার দুঃসাধ্য-পরীক্ষায় কবর নাট্যাবলী উত্তীর্ণ হয়েছে। বলা যেতে পারে মানুষ, নষ্টছেলে ও কবর এই তিনটি নাটিকার বিষয়েই রয়েছে সমসাময়িক-কালের বিশেষ বিশেষ উত্তেজনা, কিন্তু লেখক সেইসব পরিস্থিতিকে কেবল পশ্চাৎপট হিসেবেই ব্যবহার করতে পেরেছেন। অন্যথায় লেখা হত একান্ত সাময়িক ও প্রচারধর্মী। বক্তব্য প্রকাশে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হলেও লেখকের গণতান্ত্রিক চৈতন্য ও মানবিকতা এগুলোকে বিরল বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে।

যথেষ্ট ভাবাতিরেক ও খাঁটি অর্থে অতিশয়োক্তি থাকা সত্ত্বেও বলতে পারি, 'কবর' নাটকটি আমাদের নাট্য-সাহিত্যের একটি ছোট্ট ক্লাসিক। এবং যে গুণ একে স্মরণীয় করেছে তা এর বিষয়-মাহাত্ম্য ততটা নয় যতটা রচনাশৈলীগত বক্রোক্তি। ঘটনাগ্রন্থি অবশ্য সরল, কিন্তু বক্রোক্তির রন্ধ্র পথে এমনভাবে উদঘাটিত যে, তা দ্বিগুণ তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

কবরে লেখক নাট্যপ্রকরণের যে সূত্রপাত করেছেন দণ্ডকারণ্যে তারই সম্প্রসারণ দেখতে পাই। কবরে মনোবিপর্যয়ের দৃশ্যগত রূপায়নরীতির মধ্যে দণ্ডকারণ্যের স্থান-কাল-পাত্র-সমীকরণের বীজ রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এর অর্থ পরবর্তী রচনা পূর্ববর্তী রচনাবলীরই স্বাভাবিক পরিণতি,

এবং এক্ষেত্রে নাট্যকারের কৃতিত্ব সৃজনকর্মে যতটা নয় তার চেয়ে বেশী আধুনিক প্রকরণের সংযোজন প্রয়াসে। আধুনিক নাট্যপ্রকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য মনোবিকলনে ও প্রতীক রচনায়, যা স্বভাবতই জটিলতার প্রশ্রয়ী এবং সেখানে সাধারণত স্থান ও কাল ভগ্ন, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, চরিত্রের কোনো বিকারই একমাত্র যোগসূত্র। মানুষের মনোরাজ্যের বিসর্পিল কূটৈষণাকে রূপ দিতে গিয়ে লেখক অনেক সময় উদ্ভট, অবিশ্বাস্য কিম্ভূত রূপ প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন বিদেশী সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর। শিল্পের সচলরূপে ও আধুনিকতায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, তবু বলবো এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, আধুনিক ও ভঙ্গিসর্বস্বতা এক জিনিস নয়। আধুনিকতা করে রূপসৃষ্টি, আর ভঙ্গি বিরূপতা। দ্বিতীয়ত, নাটক স্বভাবগত গণতান্ত্রিক শিল্প, সেজন্য রচনাশৈলীর অতিবৈদগ্ধ্য তার উৎকর্ষের পরিপন্থী যদিও পরীক্ষার খাতিরে সব কিছু চলতে পারে।

'দণ্ডে' দাম্পত্য মনস্তত্ত্ব, 'দণ্ডধরে' প্রণয়ের এবং 'দণ্ডকারণ্যে' মনো-বিকৃতির একটি প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়েছে। প্রথম দুটি রচনায় চোরের বংশদণ্ড প্রবেশ করলেও তিনটি লেখারই অভ্যন্তরে দণ্ড-অভিধা যেন প্রতীকের মতোই কাজ করছে। তবে শাস্তিভোগের মাধ্যমেই স্বস্তি। এ যদি লেখকের দর্শন হয় তা'হলে এই প্রচারণা অত্যন্ত মামুলি যদিও তিনটি নাট্যখণ্ডেই সংঘাত রচনা ও নাট্যরস সত্যি উপভোগ্য।

'দণ্ডকারণ্য' নাটিকার পৌরাণিকী সহসা চমক সৃষ্টি করে এবং তা যে রঙ্গমঞ্চে দর্শক-মনোযোগ আকর্ষণের বিশেষ উপযোগী তাও স্বীকার্য। কিন্তু এই সঞ্চরণ মূল নকশার সঙ্গে যথাযথ সমন্বিত হয়নি বলেই আমার ধারণা। লেখকের বক্তব্যও অস্পষ্ট, বিচলিত, উদ্দেশ্যহীন। নতুনের সঙ্গে পুরাতনের সমান্তরাল অংকনে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বলেই এই অদ্ভুত রসাত্মক পরিস্থিতি।

আলোচ্য রচনাবলীতে মুনীর চৌধুরী নাটক রচনার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ক্ষেত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। এটা কম কথা নয়। তিনি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন রচনাংশে, আমরা এখন তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অখণ্ড নাটকের প্রত্যাশী।

৬

আধুনিক কবিতার অনিষ্ট কি পতনের অবারিত সিঁড়ি না জীবনের আন্দোলিত বৃক্ষশ্রেণী, সে আমরা জানি না। দোলক দুলছে মধ্যবিন্দুতে, না মধ্যবিন্দুতে নয়, যেন তিমির-দেয়ালের কাছাকাছি যেখান থেকে খাদের দিকে তার প্রবেশ বেশী, এবং সেখান থেকে উঠছে যে ঘণ্টাধ্বনি তার মধ্যে যন্ত্রণা বিষাদ শূন্যতা। এইজন্য আধুনিক কবিতার একটি লক্ষণকে আমরা বিশিষ্ট বলে ঘোষণা করতে পারি, তা হলো, সে চরমাশ্রয়ী। সে চরমকে কামনা করে, চরমকে প্রকাশ করতে চায়, চরমভাবে। কবিতা যেন শিল্প-মাত্রই নয়, বরং আত্মসাধন। অথচ আত্মসাধনের ঐকান্তিকতায়, যেখানে শুধু আস্বাদন ও নিমজ্জন, কবিতার নিশ্চিত সমাধি। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে, র‍্যাঁবো বোদলেয়ার মালার্মে এঁরা অবগাহনের মধ্যে প্রত্যাগমনের আশ্রয়সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন, যেজন্য তাঁরা সাধক হননি, হয়েছেন কবি।

এইখানেই আমার মনে হয়, কবিতার সোনার চাবি লুকানো রয়েছে, যাকে খুঁজে পাওয়া অনেক সময় কঠিন।

এই ক্রিয়াশীলতাকে আমরা বলতে পারি ত্রিভুজাকৃতি যার প্রথম কবিসত্তা, দ্বিতীয় পাঠকমানস এবং তৃতীয় অভিজ্ঞতাক্ষেত্র। এমনো হতে পারে কবিসত্তার অতি-প্রাধান্য যেমন অধিকাংশ আধুনিক কবিতায়, কবিতাকে পাঠকের কাছ থেকে ক্রমে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, আবার কোন যুগে, এ দুই কাছাকাছি আসে, পরস্পর সম্মিলিত হয় যেন দুই নদী এক মোহনায় যার ফল প্রথানিহিত কবিতাপ্রবাহ, কিন্তু তিনের সমানুপাতিক সামঞ্জস্যই শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্মলগ্ন।

অতএব কবির প্রত্যাগমনের সে বহির্ক্ষেত্র থেকেই হোক, কিংবা আত্মসাধন থেকেই হোক, প্রকৃতি-নির্ণয় কবিতাবিচারের প্রথম অঙ্গীকার। এই আমার সিদ্ধান্ত, এবং বলাবাহুল্য, এই প্রত্যাগমন তো ভাব ও রূপের সামঞ্জস্যে নির্মিত নকশারই নামান্তর। সভ্যতার যে বিপর্যয় ও অবক্ষয়

তার মধ্যে আশাহত কবি ক্রমেই অন্তরাবর্তের মধ্যে গিয়ে পড়েছে প্রথমে নৈতিকে ও রোমান্টিকতায় এবং পরে অবচেতনের গুহা নিহিত সমাকীর্ণ কূটৈষণা ও জটিলতার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। আত্মঅবগাহন আধুনিক কবির বিধিলিপি, এমনকি যেখানে সে বহির্মুখী সেখানকার গ্রহণও আত্মঅবগাহন ব্যতীত পরিপক্ক হতে পারে না, কিন্তু প্রত্যাগমন অনেকটা অনিশ্চিত, কারণ যে ভাষা কাব্যিক ঐতিহ্য তার আশ্রয় তার সীমাবদ্ধতা এবং জন-চেতনাপ্রবাহও মূলত চেনাখাতের মধ্য দিয়েই বয়ে চলে।

তৃষ্ণার অগ্নিতে একা বইখানি হাতে নিয়ে আধুনিক কবিতার এই পট আমার মনে এলো। ফজল শাহাবুদ্দিন আমাদেব তরুণ কবিদের একজন, যদিও তাঁর প্রথম কবিতার বইটিতে আত্মস্থ হওয়ার বদলে বয়েছে একটি অস্থিরতার ছাপ। এই বইয়ের মোট সাতচল্লিশটি কবিতাব অঙ্গে ও অন্তরে, প্রায় সর্বত্র এই লক্ষণ পরিদৃশ্যমান। একেকটি কবিতায় যে বৃত্ত তিনি এঁকেছেন তা অবশ্যই একেকটি যন্ত্রণাঘূর্ণি, কিন্তু আমাব মনে হয় অস্থির ভিতরে, রক্তের ভিতবে যন্ত্রণাব জন্ম না হলে তাব মাধ্যমে অকিঞ্চিৎকরতার ছোপ লাগে তা থেকে এই কবিতা মুক্ত নয। সেজন্য এই বৃত্তসমূহ যেন প্রকৃত যন্ত্রণার চাইতে যন্ত্রণাবিলাস রূপেই দেখা দিয়েছে— যার অন্য নাম দেওয়া যেতে পারে সেন্টিমেণ্টালিজম্। 'নাম' কবিতাটিও এই ভাবাতিশয্যের স্বাক্ষর বহন কবে।

আসলে এই তরুণ কবির স্বভাব যতটা না মরমিয়তায় তার চেয়ে বেশী প্রকৃতিবাদের দিকে, অথচ সেদিকে সর্বতোভাবে যেতে যেন তিনি নারাজ এবং এখানেই বৈপরীত্য ও সংঘর্ষ। এবং তার পরিণাম ব্যর্থতা। অথচ যখনই স্বকীয় চরিত্রে আন্তরিক হয়েছেন তখন এমন প্রগাঢ় স্তবক লিখতে পেরেছেন যা প্রকৃত কবিতা হয়ে উঠেছে:

> ক্রমে আরও বেড়ে গেলে রাত সেই নারী
> মোহিনী শরীর থেকে নামালো নিঃশব্দে তার অপরূপ শাড়ি,
> তাকালো আবার ফিরে
> নির্জন দর্পণে, ধীরে ধীরে
> গ্রীবায় তুললো ঢেউ, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে ভাবলো সে
> ভালোবেসে

এই পুরনো অলিন্দে নরম প্রীত হাওয়ায়
যে আমাকে ক্লান্তি দেবে, হৃদয় ভরাবে যে পুরুষ সে কোথায়?

এমনি নাট্যচিত্রের মধ্যে তার শক্তির পরিচয় পাই। তেমনি আরো দু'টি কবিতা 'নিঃসঙ্গ প্রার্থনা' এবং 'রোকেয়ার মৃত্যুর পর'। 'নিঃসঙ্গ প্রার্থনা' সত্যি একটি সুন্দর কবিতা হতে পারতো যদি না কবি মাঝে মাঝে কোনো কোনো শব্দে, উপমায় ও পংক্তিতে রাত্রিশেষের অন্ধকারে সুপ্তোত্থিতা রমণীকে নিজেই আচ্ছন্ন করতেন, যেখানে কাঠামোর ভিতরে রয়েছেন সেখানে রচনা সত্যি উপভোগ্য:

কখন জোয়ার এলো দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের আশ্চর্য হৃদয়ে
জানিনা তো

প্রভু, কখন দিয়েছ তুমি কামনার কম্পিত আগুন
শরীরের স্পন্দিত তিমিরে;
কেন?
দূর ঘণ্টাধ্বনিসম
কী এক অতৃপ্ত গান আমাকে প্রত্যহ ডোবায় তার গভীর
যন্ত্রণার নিঃসঙ্গ সলিলে তোমার ইঙ্গিতে।

ফজল শাহাবুদ্দিনের প্রথম কবিতার বই তাঁর ক্ষমতায় ও বিচ্যুতিতে আমাদের যুগপৎ আকর্ষণ করে।

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় আধুনিকী বিমিশ্রণের চাইতে পূর্বতন জনপ্রিয়, রোমান্টিকের স্বরধ্বনি শুনতে পাই, সেজন্য তাঁর কবিতা আত্ম-সাধন নয়, বরং পরিচিত শিল্পকর্ম। তার যাত্রার গন্তব্য আছে, এবং তার প্রত্যাগমনও সুনিশ্চিত। সহসা সচকিত তাঁর নতুন প্রকাশিত বইয়ের নামের মধ্যেও তাঁর আকাঙক্ষা ও সিদ্ধির পরিমাপ রয়েছে। একটি স্তবকে এই কবিতাবলীর যে সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন তাও পূর্বতনেরই পুনর্ঘোষণা মাত্র।

এ-কবিতা বিরলের, একান্ত সময়ের,
শ্রাবণের শব্দের, নাসিকার আঘ্রাণ,
অপাঙ্গ দৃষ্টির, কুসুমিত বক্ষের,
অথবা তো চিত্তের মোহগত আহ্বান—

তাই হোক্ আমাদের প্রমত্ত আপ্রাণ
দীপ্তিতে দুই দেহ তারা হোক আকাশের।

সহসা সচকিত প্রেমের কবিতা। প্রেমের কবিতা সার্থক হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত সুরে, স্বকীয় কণ্ঠের গাঢ়তায়, কাজেই প্রেমের কবিতা মাত্রই স্বগতোক্তি' শেক্সপীয়রেরই হোক কিংবা হোক এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের সনেট গুচ্ছ। আমাদের আলোচ্য স্বগতোক্তিমালায় এই কণ্ঠস্বর। এই ব্যক্তিগত সুর মাঝে মাঝে চকিতে দেখা দিয়েছে,

এখন হঠাৎ একটি ছোঁয়ায়
বক্ষের ঢেউ এবং ওষ্ঠ-তাপে
তরল সময়ে দেহ মুছে যেয়ে
হঠাৎ প্রহর একাকী পলাশ ফুল—

কিংবা—

হীরক সময় মনের অতীতে
রাত্রিতে আজ তুমি শ্রাবণ।
অগাধ পুষ্প তোমার শরীর
অসম্ভবের যেন প্লাবন।

তবু মনে হয়, ব্যক্তিগত দৃশ্য এই স্বগতোক্তিমালায় অত্যন্ত কম এবং প্রেম যেন আদিম প্রবৃত্তি নয়, পরিচ্ছন্ন শিল্পকলা মাত্র। এইজন্য মনের দোলক অনর্গল তত্ত্বজিজ্ঞাসার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, অথচ কবিতায় বিশেষ করে প্রেমের কবিতায় অতিরিক্ত দার্শনিকতা অবরোধ রচনা করে, যদিও মানবরহস্য নির্ণয় এরও স্বাভাবিক প্রেরণা। এই কবিতাবলী সত্তার গভীর আলোড়নে, সুতীব্র উত্তাপে, বাহুল্যে প্রাচুর্যে, আশ্লেষে উৎকণ্ঠায়, বিচ্ছেদে বেদনায় শিহরিত, রক্তিমাভ হয়ে ওঠেনি—বরং এ যেন এক অভিজ্ঞ পরিতৃপ্ত কারুবিদের সতর্ক নিরুত্তাপ পরিমিত সংলাপ।

তবু এই কবিতাবলী অভিনন্দনযোগ্য এইজন্য যে, তারা আমাদের অনুভবকে অল্পবিস্তর সমৃদ্ধ করে, এখানে প্রত্যাগমন আসলে প্রচলিতেরই বিনীত স্বীকৃতি। দ্বিতীয়ত, রূপনির্মাণে প্রধানুগত্য যদিও অনেক সময়েই তা কবিপ্রসিদ্ধির ব্যবহারের মধ্যে সীমিত, তবু সমকালীন বিশৃংখলার মধ্যে কবিতার প্রসারের জন্য এই সুস্মিতির প্রয়োজন আছে।

পরিশিষ্ট

২

উত্তর ভাষণ

(সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদের সম্বর্ধনায় প্রদত্ত)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা আমার একটি রচনাকে পুরস্কৃত করায় আপনারা, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও জাগ্রত মানসের অধিকারী সিলেটের সুধি নাগরিকবৃন্দ, যে সম্বর্ধনার আয়োজন করেছেন তা'তে আমি যুগপৎ অভিভূত ও আনন্দিত এবং সে অনুভূতি ব্যক্তিগত কারণে নয় নিশ্চয়ই বরং এইজন্য যে, আপনাদের অভিনন্দন অতুলনীয় হৃদ্যতার স্পর্শে মহীয়ান, উপরন্তু সমস্ত উক্তিতে স্নেহজনিত আতিশয্য থাকলেও, সেগুলো একদিকে একজন শিল্পী ও অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের প্রতিই আপনাদের ভালোবাসার নিদর্শন। মানব-সম্পর্কের এই পরিচয় নিজের ধর্মেই মহামূল্যবান, এবং আমি একজন নগণ্য সাহিত্যসেবী তার উপলক্ষ্য হতে পেরেছি বলে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

আপনাদের এই ঔদার্য ও মহত্ত্বের বদলা দেয়ার মতো আমার কিছু নেই; শুধু যা দিতে পারি সে আমার অশেষ শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাই আপনারা গ্রহণ করলে কৃতার্থ হবো।

সকলেই জানি আমরা, সৃষ্টির সাফল্যই শিল্পীর পুরস্কার। যাঁরা ভেনাস গড়েন, মোনালিসা আঁকেন, তাজমহল স্থাপন করেন, রচনা করেন নবম সঙ্গীত ওথেলো কি ওয়র এ্যাণ্ড পীস, কে তাঁদের পুরস্কৃত করতে পারে? প্রকৃতিই তাঁদের পুরস্কৃত করেছেন এবং সে তাঁদের অমরতা।

কিন্তু তাই বলে, শিল্পী হলেই তার ভাগ্যে থাকবে অনাদর লাঞ্ছনা আর দারিদ্র্য, সেও কোনো কাজের কথা নয়। প্রাচীন রাজারা শিল্পীদের যে পোষকতা করতেন নিজেদের গৌরব জাহির করবার জন্য হলেও তার পিছনে একটা বিশ্বাস থাকত, সে হল কাব্যচর্চাই কালচারের পরিচয়, সভ্যতার প্রধান অঙ্গ। আধুনিক রাজারা নব্যতান্ত্রিক, পঞ্চ মকারের দেবতাই

তাঁদের উপাস্য এবং তাঁর পূজাবিধিতে কলাচর্চার কোনো স্থান নেই। তবু অন্ত্যজ হলেও শিল্পী যে একেবারে অপাংক্তেয় নয় কোনো কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের ও সংস্থার পারিতোষিক বা খেতাব প্রদানের ব্যবস্থা তার দলিল; যদিও তাঁরা জানেন না শিল্পীদের পুরস্কৃত করে নিজেরাই তাঁরা সম্মানিত হন।

অন্যপক্ষে এও বলতে হয় যে, সত্যিকারের শিল্পী কখনো সামাজিক অনুমোদন, পুরস্কার বা নগদ পাওনার মুখাপেক্ষী হতে পারেন না। তিনি হবেন সকলরকম মোহ ও সংস্কারমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনচিত্ত—বিধাতার মতো কেবল সৃষ্টির নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। অফুরন্ত, অশেষ বৈচিত্র্যময় জগৎ ও জীবনের তিনি রূপকার; তিনি হবেন ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক —কিন্তু সর্বোপরি শিল্পী। মানবতা ও শিল্পের প্রশ্নে তিনি দুনিয়ার কোনো শক্তির সঙ্গেই আপস-রফা করবেন না।

শিল্পীর এই আভিজাত্য ও অহঙ্কার আজকের দিনে যখন মানবজাতির অস্তিত্বই অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন বিশেষ প্রয়োজন, বিংশ শতাব্দীর মহামনীষী আইনস্টাইন ও বার্ট্রাণ্ড রাসেল-সহ আরো বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছেও যে সংগ্রাম-ধ্বনি তুলেছেন বৃহৎ শক্তিবর্গের নিরস্ত্রীকরণ কি আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধকরণ চুক্তিতেই তার গুরুত্ব নিঃশেষিত হবার নয়। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানেই আণবিক যুদ্ধ এবং তা'তে মানবজাতির সম্পূর্ণ ধ্বংস। কাজেই দেশ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বিশ্বব্যাপী কল্যাণ-বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলাই আজকের প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানুষের পবিত্রতম দায়িত্ব। এবং নিঃসন্দেহে এদের পুরোধা হবেন শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক।,

মানবজাতির ইতিহাসে আজকের এই পরিস্থিতি যেমন অভূতপূর্ব তেমনি শিল্পীর দায়িত্বের প্রশ্নটাও। শিল্পীর এই দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন বলেই ব্যক্তিগতভাবে, আমি কোনো প্রাপ্তির আশা করি না। আমার পাঠকদের কাছ থেকে, যে-ভাষায় আমি লিখি সেই ভাষাভাষী ও অন্য সমস্ত ভাষার মানুষের কাছ থেকে শুধু এইটুকু শুভেচ্ছাই চাই—

যতটুকুই আমার শক্তি আছে তা দিয়ে যেন আমি আমার কলমের প্রতি ফোঁটা কালি সত্য সুন্দর ও কল্যাণের জন্য খরচ করতে পারি ; আমার ব্যক্তিগত দুঃখ হতাশা ও যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে আমার কণ্ঠে যেন জেগে ওঠে নব-উজ্জীবনের গান। এইটুকু আশা, এইটুকু আমার দুরাশা। এবং এইটুকুই আমার অঙ্গীকার। এই সাধনায় ব্যর্থতাও আমার পরম পুরস্কার।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৪
আম্বুড়া, সিলেট।